Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah - IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বনাম ইসলামী সংস্কৃতি, কোনটা নিবো কেন নিবো

<u>ত্বত্ত্বাবধায়নেঃ</u>

মাওলানা সাইফুদ্দিন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

<u>জমা দিয়েছেনঃ</u>

খালেদা সুলতানা
রোলঃ ২১৫০০৭৩০

তারিখঃ ২৯ নভেম্বর, ২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah - IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বনাম ইসলামী সংস্কৃতি, কোনটা নিবো কেন নিবো

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুষাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ
মাওলানা সাইফুদ্দিন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ
খালেদা সুলতানা
রোলঃ ২১৫০০৭৩০

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah - IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

<u>প্রত্যয়ন পত্র</u>

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বনাম ইসলামী সংস্কৃতি, কোনটা নিবো কেন নিবো" বিষয়ক থিসিস টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে খালেদা সুলতানা, আইডিঃ ২১৫০০৭৩০ বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

Khaleda Sultana

<u>তত্ত্বাবধায়নেঃ</u>

মাওলানা সাইফুদ্দিন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

<u>এক্সটারনালঃ</u>

নাম
ডিপার্টমেন্ট
প্রতিষ্ঠান

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বনাম ইসলামী সংস্কৃতি, কোনটা নিবো কেন নিবো” শিরোনামে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা সাইফুদ্দিন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ রচনা করেননি।

Khaleda Sultana

খালেদা সুলতানা

আইডিঃ ২১৫০০৭৩০
ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ
২৯ নভেম্বর, ২০২৩ ইং

<u>সূচিপত্র</u>

প্রসঙ্গকথা --- ৬

সারসংক্ষেপ --- ৭

ভূমিকা -- ১১

সংস্কৃতির তাৎপর্য ও সংজ্ঞা --- ১৬

সংস্কৃতি ও সভ্যতা -- ১৯

সংস্কৃতি ও সভ্যতার মাঝে তুলনামূলক পার্থক্য -- ২২

ধর্মের সাথে সংস্কৃতির সম্পর্ক -- ২৬

পাশ্চাত্য সংস্কৃতি -- ২৯

পাশ্চাত্য সংস্কৃতি স্বরূপ -- ৩১

পাশ্চাত্যের ধোঁকা: বাকস্বাধীনতা -- ৩১

নৈতিক অবক্ষয়ের সংস্কৃতি --- ৩৬

সেকুলারিজম কালচার -- ৩৮

সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতি -- ৩৯

পোশাকের স্বাধীনতা --- ৪৬

ব্যক্তি স্বাধীনতা ও লিঙ্গসমতা -- ৫০

পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের করাল গ্রাস -- ৫২

ইসলামী সংস্কৃতির উৎপত্তি ও বিকাশ -- ৫৭

ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য -- ৬৮

তাওহীদ --- ৬৯

মানবতাবোধ --- ৭০

সর্বজনীনতা (Universality) -- ৭০

বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব -- ৭২

শান্তি ও কল্যাণকামী -- ৭৪

কুসংস্কারমুক্ত --- ৭৫

কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ -- ৭৬

বাহ্যিক ও আত্মিক পবিত্রতা --- ৭৭

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা -- ৭৮

উদারতা, জ্ঞানালোক ও গতিশীল জীবনচেতনা ---------------------------------- ৭৯

ইসলামী সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি -- ৮২

নারী-পুরুষের সম অধিকার ও ইসলাম -- ৮৪

মানবকল্যাণমূলক অর্থনীতিব্যবস্থা -- ৮৮

ইসলামী সংস্কৃতির কাঠামো -- ৯২

পরিশেষ --- ৯৭

তথ্যসূত্র -- ১০০

প্রসঙ্গকথা

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه

আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা সেই মহান রবের যিনি আমার দ্বারা "পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বনাম ইসলামী সংস্কৃতি, কোনটা নিবো কেন নিবো" এই বিষয়ের উপর গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করার তওফিক দিয়েছেন।

গবেষণামূলক প্রবন্ধটি লিখার সময় আমি কয়েকজন স্বনামধন্য লেখকের বইয়ের সহায়তা নিয়েছি। তথ্যসূত্রে সেগুলো উল্লেখ করেছি। তাই পুরোপুরি মৌলিক লেখা বলাটা ইনসাফ হবেনা আবার হুবহু তুলে ধরেছি তাও নয়। চেষ্টা করেছি এই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বই, অনলাইন থেকে বিভিন্ন আর্টিকেল পড়ে নিজের ভাষায় যতটা পারা যায় আলোচনা করার। এক্ষেত্রে তথ্য, উপাত্ত, সংজ্ঞা, কিছু শব্দের ব্যাখ্যা লেখকদের লিখা থেকে তুলে ধরেছি। আবার নিজস্ব চিন্তাভাবনা মতামতও যুক্ত করেছি। এই গবেষণা কর্মটি করতে গিয়ে বর্তমান প্রেক্ষাপটে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মূলরূপের ভেতরের অন্ধকাররূপটা যেমন ভালোভাবে অনুধাবন করতে পেরেছি। তেমন নিজস্ব ইসলামী সংস্কৃতির মজবুত শিকড় চেনা ও তার পরিচর্যার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করতে পেরেছি। আলহামদুলিল্লাহ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমার মত অক্ষম বান্দার ইখলাস ও নিয়তের সকল ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁরই। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবীগণের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) ওপর।

খালেদা সুলতানা
ব্যাচ: আলিম
রোল: ২১৫০০৭৩০
ইসলামিক অনলাইন মাদরাসা

সারসংক্ষেপ

একজন নওমুসলিম বলেছিলেন, "যুদ্ধ আর মারণাস্ত্র দ্বারা পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদেরকে বিকলাঙ্গ করেছে বলেই তো আমরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের আত্মার মৃত্যু ঘটিয়েছে। বস্তু পূজার দ্বারা আমাদের লোভ লালসাকে চাঙ্গা করে আমাদের মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু ঘটিয়েছে। ইসলামের যে আধ্যাত্ববাদের মধ্যে আমরা মানুষের মর্যাদা এবং চিত্তে শান্তি খুঁজে পেয়েছি, এখন আমাদের সামনে ইসলামের সে আধ্যাত্ববাদ সম্পর্কে আলোচনা করার সময় এসেছে।"

বর্তমান মুসলিম সমাজেও পাশ্চাত্য তথা পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও পৌত্তলিকতার ভাবধারায় গড়া সংস্কৃতি বিরাজমান। বিদেশী ও বিজাতীয় ভাবধারার প্রভাবে মুসলিম সংস্কৃতি আজ পংকিলতাময়। আজ আমাদের সংস্কৃতিকে বিদেশী ও বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত করে ইসলামী আদর্শের মানে উত্তীর্ন এক নতুন সংস্কৃতি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ইসলামী আদর্শবাদীদের সংগ্রাম চালাতে হবে। এ সংগ্রাম কঠিন ও দু:সাধ্য। এ পথে পদে পদে নানাবিধ বাধা বিপত্তি, প্রতিবন্ধক ও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও সাহসিকতার সাথে এ সংগ্রাম চালাতে পারলে এর জয় হবেই ইনশাআল্লাহ। বর্তমান বিশ্ব এমনি ভারসাম্যপূর্ণ, মানবতাবাদী ও সকল মানুষের জন্য কল্যাণকর এক সংস্কৃতির প্রতীক্ষায় উদগ্রীব। বর্তমানে পাশ্চাত্য পংকিল সমাজে প্রচলিত সংস্কৃতি যেনো মুসলিমদের ভুলিয়ে দিতে না পারে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি। যা কেবল সুস্থ সুন্দর মার্জিতই নয় বরং জীবনযাপনের শ্রেষ্ঠ পরিচালনা পদ্ধতিও বটে। তাই আমাদের জানতে হবে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির চোখ ধাধানো মনমাতানো উপাদানগুলোর পেছনের অন্ধকারকে। জানতে হবে মুসলিম জাতির ইসলামী সংস্কৃতির ইতিহাস। যে সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে নির্মিত সমাজ ও সভ্যতার

স্পর্শে মাত্র চার দশকের মধ্যেই এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপের বিরাট অঞ্চলে মানবতার নব জাগরন ঘটেছিল। যুগ যুগান্ত কালের অজ্ঞতার অপসারন হয়েছিল।

আমাদের আকীদা বা বিশ্বাসের উৎস মূলের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে আমরা এমন এক স্বতন্ত্র জাতি যে জাতি মানবতার জন্য ঈপ্সিত সাংস্কৃতিক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। আমাদের এই স্বাতন্ত্র বর্ণ গোত্র বা বংশগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র নয় বরং স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা কুরআনে মুসলিম মিল্লাতের অস্তিত্ব সম্পর্কে বলেছেন –

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ

"তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত, মানবজাতির (সর্বাত্মক কল্যাণের) জন্য তোমাদের আবির্ভুত করা হয়েছে, তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ কর ও আল্লাহর প্রতি ঈমান রক্ষা করে চল।"

(সূরা আল ইমরান: ১১০)

আলোচ্য আয়াতে আমাদের এমন সব বিশ্বাস এবং নীতি চরিত্রের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যা আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম জাতি হওয়ার যোগ্যতা সৃষ্টি করেছেন। একটি আয়াতে বলা হয়েছে –

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ

وَ لِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ

"আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎ কাজের আদেশ করবে ও অসৎ কার্য হতে নিষেধ করবে। সকল কাজের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে।"

(সূরা হাজ্ব: ৪১)

যে সব বৈশিষ্ট্য আমাদের সংস্কৃতিকে সর্বোৎকৃষ্ট সংস্কৃতির মর্যাদায় সিক্ত করেছে, আলোচ্য আয়াতে সেসব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে অন্যত্র জায়গায় বলা হয়েছে-

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا

"(হে মুসলিমগণ!) এভাবেই আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা অন্যান্য লোক সম্পর্কে সাক্ষী হও এবং রাসূল হন তোমাদের পক্ষে সাক্ষী।"
(সূরা বাকারাহ: ১৪৩)

এ আয়াত আমাদেরকে একটি মিশনের পতাকাবাহী চিহ্নিত করছে। সে মিশনটি হচ্ছে, আমরা মানব জাতির নেতৃত্ব দান করব, সত্য এবং কল্যাণের দিকে তাদেরকে আহ্বান জানাব। কোনও একটি বিশেষ বংশ যুগ বা সময়ের জন্য এ দায়িত্ব সীমাবদ্ধ নয়।

নৈতিক মূল্যবোধের পরিবর্তে পাশ্চাত্যের শিক্ষা-দর্শন এবং সাহিত্যে, কৃষ্টি কালচারে ভোগবাদী চিন্তা দর্শনের প্রতিফলন ঘটেছে। দেখা যায় নির্মল সৌন্দর্য বোধের পরিবর্তে উৎকট নগ্নতা ও অশ্লীলতার ছায়াপাত। ফলে আজকের মুসলিম জনগোষ্ঠী পাশ্চাত্যের প্রভাবে আদর্শিক মূল্যবোধ হারিয়ে কার্যত এক বিশৃঙ্খল জনারণ্যে পরিণত হয়েছে। এই বিপর্যয় থেকে মুসলিম জাতিকে উদ্ধার করার জন্য আজকে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে

মুসলিম জাতির প্রকৃত স্বরূপ অন্বেষার, তার হারানো বৈশিষ্ট্য এবং স্বকীয়তাকে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তার নিজস্ব সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ সম্পর্কে জানার।

বিশেষত "আধুনিকতার" নামে পাশ্চাত্য সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতা মুসলিম জাতিকে একটি মেরুদণ্ডহীন জনগোষ্ঠীতে পরিণত করছে তাদেরকে ধ্বংসের অতল গহব্বরে ঠেলে দিচ্ছে। বিদেশী ও বিজাতীয় ভাবধারার প্রভাবে মুসলিম সংস্কৃতি আজ পংকিলতাময়। আমাদের সংস্কৃতিকে বিদেশি ও বিজাতীয় উপাদান এবং ভাবধারা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে ইসলামী আদর্শের মানে উত্তীর্ণ এক নতুন সংস্কৃতি গড়ে তোলা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে ভারসাম্যপূর্ণ মানবতাবাদী ও সর্ব মানুষের জন্য কল্যাণকর ইসলামী সংস্কৃতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য সমূহ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আমি এই লিখার মাধ্যমে।

প্রাচীন এবং আধুনিক সকল সংস্কৃতি হতে আমাদের সংস্কৃতি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মন্ডিত। সভ্যতা থেকেও উন্নতর এবং পূর্ণতম সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করার যোগ্যতা ক্ষমতা আমাদের মধ্যে বর্তমান। আমাদের জাতির পূর্বপুরুষরা যে ধরনের সংস্কৃতির ঐতিহ্য স্থাপন করেছিলেন আজকের যুব সমাজকে সেই সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়া আমার এই গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য।। নিজেদের এ দায়িত্বের কথা স্মরণ করা এবং পরবর্তী প্রজন্মকে এ দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার এখনই উপযুক্ত সময়।

ভূমিকা

সংস্কৃতি মৌল ভাবধারার দিক দিয়ে যেন একটি প্রবহমান নদী। এ নদী যেখান থেকেই প্রবাহিত হয়, জীবনের অস্তিত্ব, অবয়ব চেতনার ওপর তার গভীর স্বাক্ষর রেখে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ সংস্কৃতি-নদীর প্রবাহ সাধারণ মানুষের দৃষ্টির আড়ালেই থেকে যায়। তারা হয় তা দেখতেই পায় না কিংবা দেখেও ঠিক অনুভব করতে সক্ষম হয় না। তাকে দেখবার ও অনুভব করার জন্যে চাই অনুভূতিশীল মন এবং সুক্ষ দৃষ্টিসম্পন্ন চোখ। কথাটি এভাবেও বলা যায় যে, অনুভূতিশীল মন এবং দৃষ্টিসম্পন্ন চোখই সংস্কৃতির প্রয়োজন অনুভব করতে পারে – স্পষ্টত অবলোকন করতে পারে তার ভালো ও মন্দ রূপ। আর নদীর ঘোলা-পানির পরিবর্তে পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ পানি গ্রহণের ন্যায় পংকিল সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে পবিত্র ও নির্মল ভাবসম্পন্ন সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে পারে কেবলমাত্র সচেতন লোকেরাই।

যাদের মন চেতনাহীন, মগজ বুদ্ধিহীন ও চোখ আলোশূন্য, সংস্কৃতির প্রবহমান দরিয়া থেকে তারাও আকণ্ঠ পানি পান করে বটে; কিন্তু সে পানি হয় ঘোলাটে ময়লাযুক্ত, পুঁতিগন্ধময় ও অপরিচ্ছন্ন। এজন্য সংস্কৃতির শালীন, পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র এবং অশালীন ও অপরিচ্ছন্ন তথা পংকিল ও কদর্য - এ দু ভাগে বিভক্ত হয়ে যাওয়া একান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার – ঠিক যেমন প্রবহমান নদী-নালায় এ দু ধরনেরই পানিস্রোত পাশাপাশি প্রবাহিত হতে থাকে চিরন্তনভাবে। যেসব লোক অন্ধ ও অচেতনভাবে স্বীয় সংস্কৃতির চতুঃসীমার মধ্যে থাকে অথচ তার প্রয়োজন ও দাবি-দাওয়ার সাথে নিজেদের খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করেনা, সেজন্যে তারা কোন সচেতন ও সজাগ চেষ্টায় নিয়োজিত হয়না – সেজন্যে তাদের ভেতর জেগে ওঠেনা কোন আত্মানুভূতি, তারা এই শেষোক্ত পর্যায়ের সংস্কৃতিরই ধারক হয়ে থাকে। কেননা তাদের মতে সংস্কৃতি কখনো ভালো বা মন্দ কিংবা স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন হতে পারেনা, হতে পারেনা তা পবিত্র ও শালীনতাপূর্ণ।

আমাদের কর্মনীতি, কার্যপদ্ধতি ও মূল্যমান বরং আমাদের চিন্তা-ভাবনা সবকিছুই আমাদের সংস্কৃতির ফসল। সংস্কৃতিই এসব গড়ে তোলে পরিচ্ছন্ন ও শালীনতাপূর্ণ করে। মানবীয় চেতনায় ও মূল্যবোধে যা কিছু বিশ্লিষ্টতা থাকে স্বাভাবিকভাবে সংস্কৃতির অনুভূতি ও নিজস্ব মূল্যবোধই তাকে উৎকর্ষ দান করে, সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রূপে গড়ে তোলে। এটাই মানুষকে অবচেতনার অন্ধকারাচ্ছন্ন গহবর থেকে চেতনার আলোকোজ্জ্বল পরিবেশ তথা বাইরের দুনিয়ায় নিয়ে আসে এবং তাকে প্রস্ফুটিত করে তোলে। কিন্তু তাই বলে তার মৌল সাংস্কৃতিক চেতনায় কোন ব্যতিক্রম কিংবা পরিবর্তন ঘটেনা। একথা ঠিক যে, সংস্কৃতি মানুষের মানসিক যোগ্যতা-প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের প্রকাশ মাধ্যম। অন্য কথায়, কোন জাতির সংস্কৃতি সে জাতির তাবৎ লোকদের মানসিক যোগ্যতা-প্রতিভারই প্রতিবিম্ব। এজন্যে একদিকে যেমন বলা যায় যে, অসভ্য জাতিগুলোর সংস্কৃতিবোধ ও সংস্কৃতির প্রকাশ নিম্নমানের হয় এবং সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তারও বিকাশ ঘটে, তেমনি অপরদিকেও বলা যায় বিভিন্ন ধরনের আকীদা-বিশ্বাস ও জীবন-দর্শন-বিশিষ্ট জাতির সংস্কৃতি ও তার প্রকাশ হয় এক ধরনের। অর্থাৎ বিভিন্ন রূপ আকীদা-বিশ্বাস ও জীবন-দর্শন-বিশিষ্ট জাতির সংস্কৃতি ও তার প্রকাশ বিভিন্ন রূপ হতে বাধ্য। কেননা সংস্কৃতির মৌল উৎস জীবনবোধ, চিন্তা-বিশ্বাস ও মানসিকতা। অতএব জীবন-দর্শনের পার্থক্যের কারণে সাংস্কৃতিক বোধ ও প্রকাশেও অনুরূপ পার্থক্য হওয়া অনিবার্য ব্যাপার।

সংস্কৃতির এ পার্থক্যের প্রতিফলন ঘটে লোকদের মননে ও জীবনে এবং মৌল অনুভূতিতে যেমন, তার প্রকাশ মাধ্যমেও তেমন। তাই ইতিহাসে স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়, এক ব্যক্তির এক প্রকারের জীবন-দর্শন থাকাকালে তার মানসিক অবস্থা ও জীবন-চরিত্র ছিল এক ধরনের; কিন্তু পরবর্তীকালে তার সে জীবন-দর্শনে যখন মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হল, তখন তার মানসিকতা, জীবনবোধ ও চরিত্রেও আমূল পরিবর্তন সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। তার সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকাশ-মাধ্যমও সমূলে বদলে গেল। এ পরিবর্তনের মূলে জীবন-দর্শনের পরিবর্তন ছাড়া আর কোন কারণই পরিদৃষ্ট হয়না।

আরব জাতির ইতিহাসই এ পর্যায়ের বড় দৃষ্টান্ত। যে আরব জনগণ ছিল সভ্যতা-ভব্যতা ও শালীনতা-শিষ্টাচার বিমুখ, অনুন্নত সামাজিক সংস্থা ও ব্যবস্থাসম্পন্ন, অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতার প্রতীক, লুঠতরাজ ও মারামারি-কাটাকাটিতে অভ্যস্ত-যাদের নিকট মানুষের জীবনের মূল্য ছিল অতি তুচ্ছ, মাত্র দশ বছরের মধ্যেই তারা এক নবতর জীবন দর্শনের ধারক লোক-সমষ্টি হিসেবে সুসংবদ্ধ হয়ে উঠল এবং আঠারো বছরের মধ্যেই সেই আরব জাতির মন-মানস, জীবন-চরিত্র, মূল্যমান ও জীবনবোধ আমূল পাল্টে গেল এবং সম্পূর্ণ নতুন রূপ পরিগ্রহ করলো।

পূর্বের অন্ধকার জীবন নবীন আলোকচ্ছটায় ঝলমল করে উঠল, মনের সংকীর্ণতা ও নীচতা-হীনতা ঘুচে গিয়ে পারস্পরিক ঔদার্য, প্রেম-প্রীতি, সহনশীলতা ও মার্জিত রুচিশীলতার সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটল মনন ও জীবনের সর্বত্র। পূর্বে যা ছিল ন্যায়, এক্ষণে তা চরম অন্যায় এবং পূর্বে যা ছিল অন্যায়, এক্ষণে তাই অপরিহার্য কর্তব্য বিবেচিত হতে লাগল। মানুষের মূল্য ও মর্যাদা হল প্রতিষ্ঠিত ও সর্বজনস্বীকৃত। অশালীনতা ও অশ্লীলতা দূর হয়ে সেখানে স্থান নিল লজ্জাশীলতা ও সুরুচিশীলতা। যে সমাজে মানুষের মর্যাদা ছিল কুকুর বিড়ালের চাইতেও নিকৃষ্ট, সেখানে তা এমন অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করল যে, একমাত্র সৃষ্টিকর্তার পর আসমান ও জমিনের সবকিছুর উর্ধ্বে নির্ধারিত হল তার স্থান। উদ্দেশ্যহীন ও লক্ষ্যহারা মানুষের সামনে এক মহত্তম জীবন-লক্ষ্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। অন্ধকার যবনিকার অবসানে ঘটল নতুন এক আলোকোজ্জ্বল দিবসের সূর্যোদয়। একই ব্যক্তি ও একই জাতির জীবনে রাত্রির অবসানে দিনের সূর্যোদয়ের এ ঘটনা সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে আমাদের সামনে। জীবন-দর্শনের পরিবর্তনে সংস্কৃতির বাহ্যিক প্রকাশের পরিবর্তন হওয়ার এ ঘটনা এক শ্বাশ্বত ও চিরন্তন ব্যাপার এবং একে অস্বীকার করার উপায় নেই।

- যে ভিত্তির ওপর পাশ্চাত্য সংস্কৃতি দাঁড়িয়ে আছে, তা একান্তই বস্তুবাদী। আধ্যাত্ববাদ এবং ধর্মের অন্তর্নিহিত প্রভাবের সাথে তার দূরতম সম্পর্কও নেই। ফলে আমরা

দেখতে পাই, পাশ্চাত্য দেশগুলোতে ধর্ম দিন দিন তার প্রভাব হারাচ্ছে। পাশ্চাত্যের মানুষ আজ নিজেকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে তলিয়ে যেতে দেখে ভীষন অস্থিরতায় ছটফট করছে। তাদের চক্ষুষ্মান অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন দার্শনিকরা ধর্মের আত্মিক মূল্যমান পুনরায় ফিরিয়ে আনতে আগ্রহী। কিন্তু কি করে তা তাদের পক্ষে সম্ভব? ধর্মের প্রতি অস্বীকৃতি এবং বস্তুবাদের বিষবৃক্ষ এসব তিক্ত ফল ফলাচ্ছে। তার শিকড় এখন দৃঢ়ভাবে আসন গেড়ে বসেছে।

যে কোন প্রত্যাদিষ্ট ধর্মের কথাই ধরুন তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, সে ধর্ম মানব সমাজে ইনসাফ এবং ন্যায়পরায়নতার বিকাশ সাধন করে, চিত্তে শান্তি স্থাপন করে এবং দুঃখানুভূতি হ্রাস করে জীবনের বোঝাকে হালকা করতে চায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তা মানবমনের লোভ লালসা এবং পাশবিক উত্তেজনা প্রশমিত করতে প্রয়াসী।

উন্নতির যুগে ইসলাম এ কাজই আঞ্জাম দিয়েছে। কিন্তু যখন আমাদের সামাজিক জীবনে ইসলামের এই খোদায়ী মিশনের কার্যকারিতা শেষ হয়েছে; ব্যক্তি এবং সমাজের আকাংখা উদ্দীপিতকরন, সংকল্পের পুনরুজ্জীবন, দয়া-মায়া এবং ত্যাগের মনোভাব জাগিয়ে তুলতে পারে এমন কার্যকর হাতিয়ার ভোঁতা হয়ে পড়লে পাশ্চাত্য সভ্যতা তার অনুসারীদের জন্য যে দূর্ভাগ্য বয়ে নিয়েছিল, আমাদেরকেও তার স্বাদ আস্বাদন করতে হয়েছে ভালোভাবেই।

ধর্মের সাথে সংঘাতে অবতীর্ণ হয়ে স্বতন্ত্র পথ বেছে নিয়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ধারণা করে বসেছিল যে, কোন ধর্মের প্রতি প্রত্যাবর্তন না করেই সে আপন পথ পরিক্রমা অব্যাহত রাখতে পারে, রাখতে পারে তার আত্মাকে সজীব এবং চিত্তকে সতেজ। এমন কোন ধর্মের প্রতি প্রত্যাবর্তনের তার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই । কিন্তু এটা ছিল নিছক একটি ভ্রান্ত ধারণা মাত্র।

এরই প্রেক্ষিতে পাশ্চাত্যের মানুষ আজ আত্মিক জীবনের সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা এমন এক আত্মিক জীবন সন্ধান করে বেড়াচ্ছে, যেখানে বস্তুবাদী সভ্যতার উপস্থাপিত সকল অস্থিরতা, চঞ্চলতা, দূর্ভোগ- দুশ্চিন্তা থেকে তারা নিষ্কৃতি

লাভ করতে পারে। পাশ্চাত্য সভ্যতার বদৌলতে সে অস্থিরতা তাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। সুস্থ চিন্তার অধিকারী নৈতিক এবং আত্মিক অনুভূতি সম্পন্ন পাশ্চাত্যের যে কোন ব্যক্তি এর সত্যতা স্বীকার করবে।

নওমুসলিম ইংরেজ প্রাচ্যবিদ জনাব আবু বকর একবার তার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী শুনিয়েছিলেন। তিনি কায়রোর ফুয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন এবং সেখানেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমানে তিনি লন্ডস্থ ন্যাশনাল লাইব্রেরীর প্রাচ্যবিভাগের সচিব। তিনি তার ইসলাম গ্রহণের কারণ উল্লেখ করে বলেন," পাশ্চাত্য সংস্কৃতি মানুষের মানবিক মর্যাদা এবং তার রূপ সৌন্দর্য উভয়টি ধ্বংস করেছে।"

তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো, মানুষের মর্যাদা ধ্বংসের ব্যাপারে আপনার সাথে একমত কিন্তু রূপ সৌন্দর্য বিনাশের ব্যাপারে কিভাবে আপনি বলছেন। যেখানে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে অত্যন্ত সুন্দর এবং হৃদয়গ্রাহী বলে মনে করা হয়। তিনি বলেন, " এই সংস্কৃতি আত্মা অন্তস্থিত অনুভূতি এবং নৈতিকতার রূপ সৌন্দর্যকে ধ্বংস করে ছেড়েছে।"

অপরদিকে ইসলামি সংস্কৃতিতে মানুষের সমগ্র সত্তার যুগপৎ উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনই মূল লক্ষ্য। দৈহিক উন্নতি এবং নৈতিক ও আত্মিক পূর্নত্ব, চরিত্র -স্বভাব, সৌন্দর্যপ্রীতি ও সুরুচি প্রবণতা, দেহ ও মনের সকল দাবির ভারসাম্যপূর্ন সামঞ্জস্য বিধানই ইসলামি সংস্কৃতির দাবি।

সংস্কৃতির তাৎপর্য ও সংজ্ঞা

'সংস্কৃতি' বাংলা শব্দ। নতুন বাংলা অভিধানে এর অর্থ লেখা হয়েছেঃ সভ্যতাজনিত উৎকর্ষ, কৃষ্টি, Culture। অপর এক গ্রন্থকারের ভাষায় বলা যায়ঃ 'সাধারণত সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি মার্জিত রুচি বা অভ্যাসজাত উৎকর্ষ। সংস্কৃতিকে ইংরেজিতে বলা হয় Culture । এই শব্দটি ল্যাটিন শব্দ CALTURE থেকে গৃহীত। এর অর্থ হল কৃষিকাজ বা চাষাবাদ। তার মানে- জমিতে উপযুক্ত ভাবে বীজ বপন ও পানি সিঞ্চন করা, বীজের রক্ষণাবেক্ষণ, লালন-পালন ও বিকাশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা। বিশেষজ্ঞরা Culture শব্দের অনেকগুলো অর্থ উল্লেখ করেছেন বটে, কিন্তু এ শব্দকে সাধারণত উত্তম স্বভাব-চরিত্র ও ভদ্রজনোচিত আচার ব্যবহার ও আচরণ অর্থেও ব্যবহার করা হয়। ললিতকলাকেও Culture বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

অশিক্ষিত ও অমার্জিত স্বভাবের লোকদেরকে Uncultured এবং সুশিক্ষাপ্রাপ্ত, সুরুচি-সম্পন্ন ও ভদ্র আচরণবিশিষ্ট মানুষকে Cultured man বলা হয়। আবার কেউ কেউ মনে করেন, Culture বা সংস্কৃতি বলতে একদিকে মানুষের জাগতিক ও বৈষয়িক উন্নতি বোঝায় আর অপরদিকে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষকেও সংস্কৃতি বলে অভিহিত করা যায়।

এ দেশের জনৈক চিন্তাবিদের মতেঃ সংস্কৃতি শব্দটি 'সংস্কার' থেকে গঠিত। অভিধানে তার অর্থঃ কোন জিনিসের দোষ ত্রুটি বা ময়লা আবর্জনা দূর করে তাকে ঠিকঠাক করে দেওয়া। অর্থাৎ সংশোধন ও পরিশুদ্ধকরণের কাজকে সংস্কৃতি বলা হয়। খনি থেকে উত্তোলিত কাঁচা স্বর্ণকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করণ এবং পরে তা দিয়ে অলংকারাদি বানানোও সংস্কৃতির মূল কাজ। ইংরেজি শব্দ Culture এর বাংলা অর্থ করা হয় সংস্কৃতি। মূলত সংস্কৃতি সংস্কৃত ভাষার শব্দ। তার সাধারণ বোধগম্য অর্থ হলো উত্তম ও উন্নত মানের চরিত্র।

অধ্যাপক MURRAY তার লিখিত ইংরেজি ডিকশনারিতে বলেছেনঃ Civilization বা সভ্যতা বলতে একটি জাতির উন্নত সমাজ ব্যবস্থা বুঝায়, যাতে রাষ্ট্র-সরকার, নাগরিক অধিকার, ধর্মমত, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক আইন বিধান এবং সুসংগঠিত শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমান রয়েছে। আর Culture বা সংস্কৃতি হচ্ছে সভ্যতা বা Civilization এরই মানসিক ও রুচিগত ব্যাপার। তাদের থাকা খাওয়ার নিয়ম-নীতি, সামাজিক ও সামষ্টিক আচার-অনুষ্ঠান, স্বভাব-চরিত্র এবং আনন্দ ফুর্তি লাভের উপকরণ, আনন্দ-উৎসব, ললিতকলা, শিল্পচর্চা, সামষ্টিক অভ্যাস, পারস্পরিক আলাপ-ব্যবহার ও আচরণ বিধি শামিল রয়েছে। এসবের মাধ্যমে এক একটা জাতি অপরাপর জাতি থেকে আলাদা ও বিশিষ্ট রূপে পরিচিতি লাভ করে থাকে।

প্রখ্যাত মার্কিন ঐতিহাসিক Will Duran এক নিবন্ধে Culture বা সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবেঃ 'সংস্কৃতি সভ্যতার অভ্যন্তর ও অন্তঃস্থল থেকে নিজেই উপচে ওঠে যেমনঃ ফুলবনে ফুল নিজ থেকেই ফুটে বের হয়ে আসে।' তার মতে সংস্কৃতিতে Regimentation বা কঠোর বিধিবদ্ধতা চলে না।

জাতীয় সভ্যতার প্রভাবে যেসব অভ্যাস ও স্বভাব-চরিত্র নিজ থেকে গোটা জাতির মধ্যে ছড়িয়ে থাকে, তাই সংস্কৃতি। জাতীয় সংস্কৃতি বলে কোন জিনিসকে জোর করে চালু করা যায় না। তাকে সৃষ্টি করা হয় না বরং আপনার থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। অবশ্য বিশেষ বিশেষ চিন্তা-বিশ্বাসের প্রভাবে তাতে পরিবর্তন আসা সম্ভব।

প্রখ্যাত দার্শনিক কবি T.S. Eliot Culture বা সংস্কৃতি সম্পর্কে বলেন, 'সংস্কৃতির দুটি বড় চিহ্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, তার একটি ভাবগত ঐক্য আর দ্বিতীয়টি তার প্রকাশ ক্ষেত্রে সৌন্দর্যের কোনো রূপ বা দিক।' তার মতে সংস্কৃতি ও ধর্ম সমার্থবোধক না হলেও ধর্ম সংস্কৃতির উৎস। সংস্কৃতি রাষ্ট্র শাসনপদ্ধতি, ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং দর্শনমূলক আন্দোলন-অভিযানেও প্রভাবিত হতে পারে।

Oswald Spengler এর মতে, একটি সমাজের সংস্কৃতি প্রথমে উৎকর্ষ লাভ করে। তারই ব্যাপকতা উৎকর্ষের ফলে গড়ে ওঠে সভ্যতা, যা তার প্রাথমিক ক্ষেত্র পর্যন্তই

সীমাবদ্ধ থাকেনা, তা ছড়িয়ে পড়ে ও সম্প্রসারিত হয়ে অপরাপর দেশগুলোর উপরও প্রভাব বিস্তার করে বসে। কিন্তু ডুরান্টের মতে, প্রথমে রাজ্য ও রাষ্ট্র এবং পরে সভ্যতা গড়ে ওঠে আর এরই দৃঢ় ব্যবস্থাধীনে সংস্কৃতি নিজ থেকে ফুটে ওঠে।

আর রুচিগত, মানসিক ও সৃজনশীল প্রকাশনার অবাধ বিকাশের মাধ্যমে সৌন্দর্যের একটা রূপ গড়ে ওঠে। তাতে গোটা জাতির ওপর প্রভাবশালী ধারণা-বিশ্বাস ও মূল্যমানের একটা প্রতিচ্ছবি প্রতিবিম্বিত হয়। এ পর্যায়ে আরবি শব্দ সাক্বাফাতের ব্যাখ্যাও আমাদের সামনে রাখতে হবে। তাতে সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা অধিকতর সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

বাংলা ভাষায় সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায় ইংরেজিতে সেটিই Culture এবং আরবিতে সেটি হল সাক্বাফাত। আরবি তাহযীব (تهذيب) শব্দটিও এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। সাক্বাফাত (ثقافت) এর শাব্দিক বা আভিধানিক অর্থ হলো চতুর, তীব্র সচেতন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ও সতেজ-সক্রিয় মেধাশীল হওয়া। আরবী 'সাক্বাফ' অর্থ সোজা করা, সুসভ্য করা ও শিক্ষা দেওয়া। আরবী হাযযাবা (هذب) শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, 'গাছের শাখা-প্রশাখা কেটে ঠিকঠাক করা, পবিত্র-পরিচ্ছন্ন করে তোলা, পরিশুদ্ধ ও সংশোধন করা। আর ইংরেজি Culture মানে কৃষি কাজ করা, ভূমি কর্ষণ করা ও লালন-পালন করা (Oxford Dictionary)। আর এর একটি অর্থ লেখা হয়েছেঃ Intellectual Development, Improvement by (mental or physical) Training: অর্থাৎ (মানসিক বা দৈহিক) ট্রেনিং এর সাহায্যে মানসিক উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধন।

সংস্কৃতি ও সভ্যতা

ব্যক্তির সার্বিক সুস্থতা ও ক্রমপ্রবৃদ্ধির জন্যে তার দেহ ও প্রাণ বা আত্মার ভারসাম্যপূর্ণ উৎকর্ষ একান্তই জরুরী। এ যেমন সত্য, তেমনি একটি জাতির উন্নতি তখনি সম্ভব, যখন তার সংস্কৃতি ও সভ্যতা পুরোপুরি সংরক্ষিত হবে। কেননা সংস্কৃতি হচ্ছে প্রাণ আর সভ্যতা হচ্ছে দেহ।

এম.জেড সিদ্দিকী কালচার বা সংস্কৃতি এর যথার্থ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন| তিনি শুধু সংস্কৃতির সংজ্ঞাই প্রদান করেননি, সেই সঙ্গে তামাদ্দুন বা সভ্যতা এর সাথে তার তুলনাও করেছেন| তাঁর মতে- সংস্কৃতি দ্বারা চিন্তার বিকাশ ও উন্নয়ন বুঝায় আর সভ্যতা সামাজিক উন্নতির উচ্চতম পর্যায়কে প্রকাশ করে| কাজেই বলা যায়, সংস্কৃতি মানসিক অবস্থাকে প্রকাশ করে আর সভ্যতা তারই সমান প্রকাশ ক্ষেত্রকে তুলে ধরে| সংস্কৃতির সর্ম্পক চিন্তাগত কর্মের সাথে আর সভ্যতার সর্ম্পক বৈষয়িক ও বস্তুকেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে| প্রথমটি একটি আভ্যন্তরীন ও ভাবধারাগত অবস্থা আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে বাহ্যিক জগতে তার কার্যকারিতার নাম|

ব্যক্তির সার্বিক সুস্থতা, সঠিক লালন ও বর্ধন লাভের জন্যে যেমন দেহ ও প্রাণের ভারসাম্যপূর্ণ উৎকর্ষ একান্তই আবশ্যক| তেমনি একটি জাতির সংস্কৃতি ও সভ্যতার পুরোপুরি লালন একান্তই জরুরী, সে জাতির সঠিক উন্নতির জন্যে| বলা যায় সভ্যতা হচ্ছে দেহ আর সংস্কৃতি হচ্ছে তার জীবন বা প্রাণ|

মানব জীবনের দুটি দিক। একটি বস্তগত আর দ্বিতীয়টি আধ্যাত্মিক। এ দুটিরই রয়েছে বিশেষ বিশেষ চাহিদা। সে চাহিদা পরিপূরণে মানুষ প্রতি মুহুর্তে থাকে গভীর ভাবে নিমগ্ন। একদিকে যদি দৈহিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনে তাকে টানে জীবিকার সন্ধানে, তা হলে তার আত্মার দাবি পূরণের জন্যে তার মন হয় গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। তাই মানুষের বস্তুনিষ্ঠ বৈষয়িক প্রয়োজন পূরণের জন্যে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তার সহায়তা করে। আর ধর্ম-বিশ্বাস, শিল্পকলা, সৌন্দর্যবোধ ও দর্শন নিবৃত্ত করে তার আত্মার বিকাশ। অন্য কথায়, ব্যক্তির সূক্ষ্ম ও সুকোমল আবেগ-অনুভূতি এবং হৃদয় ও আত্মার দাবিও পূর্ণ করে যে সব উপায়-উপকরণ তাই হচ্ছে সংস্কৃতি। সঙ্গীত, কবিতা, চিত্রাংকণ, সাহিত্য, ধর্ম-বিশ্বাস, দার্শনিক চিন্তা প্রভৃতি এক-একটা জাতির সংস্কৃতির প্রকাশ মাধ্যম। কোন বাহ্যিক ও বৈষয়িক উদ্দেশ্য লাভের জন্য এসব তৎপরতা সংঘটিত হয় না। আত্মিক চাহিদা পূরণই এগুলোর আসল লক্ষ্য। এসব সৃজনধর্মী কাজেই অর্জিত হয় মন ও হৃদয়ের সুখানুভূতি আনন্দ ও উৎফুল্লতা। একজন দার্শনিকের চিন্তা ও মতাদর্শ, কবির কাব্য ও কবিতা, সুরকার ও বাদ্যকারের সুর-ঝংকার এসব ব্যক্তির হৃদয়-বৃত্তির বহি:প্রকাশ। এসব মুল্যবোধ হৃদয়ানুভূতি ও আবেগ-উচ্ছাস থেকেই হয় সংস্কৃতির রূপায়ন। কিন্তু সভ্যতার রূপ এ থেকে ভিন্নতর। বস্তুনিষ্ঠ জীবনের রূঢ় বাস্তব ও প্রকৃত উন্নতির স্তর ও পর্যায় সমষ্টি হচ্ছে সভ্যতা। বিশেষ-নির্বিশেষ সকলের পক্ষেই তা মূল্যায়ন করা সহজ এবং হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব।যেমন- গ্রীক সভ্যতা, আর্য সভ্যতা, সেমিটিক সভ্যতা ইত্যাদি।

সভ্যতা মানুষের বাহ্যিক জীবন নিয়ে আলোচনা করে। বৈজ্ঞানিক আবিস্কার, বিভিন্ন শৈল্পিক দুর্লভ উপকরণ ও প্রতিষ্ঠান সভ্যতার মহাকীর্তি। কিন্তু সংস্কৃতি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ জীবন কেন্দ্রিক। অন্তর্নিহিত জীবনই হচ্ছে সংস্কৃতির লীলাক্ষেত্র। অর্থাৎ

সংস্কৃতি মন ও মগজ-কেন্দ্রিক-আবর্তন-বিবর্তনের স্বত:স্ফূর্ত ও উন্মুক্ত বহি:প্রকাশ। এ কারণে সংস্কৃতি স্বাধীন-মুক্ত পরিবেশেই যথার্থ উৎকর্ষ লাভ করতে পারে।

অনেকেই সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে এক মনে করেন। সভ্যতা (Civilization) কালচার বা সংস্কৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট, কিন্তু সংস্কৃতি (Culture) নয়। তবে এ দুয়ের মাঝে সাদৃশ্য অনস্বীকার্য। সভ্যতা আকাশচুম্বী প্রাসাদ নির্মাণ করেছে; সংস্কৃতি সে প্রাসাদকে মহিমামন্ডিত ও সুশোভিত করে দিয়েছে। বস্তুত সভ্যতা ও সংস্কৃতি দুটিই মানব জীবনের মৌল প্রয়োজন। সভ্যতা একটা জাতিকে বস্তুনিষ্ঠ শক্তিতে মহিমাময় করে আর সংস্কৃতি তাকে গতিবান করে নির্ভুল পথে।

সংস্কৃতি ও সভ্যতার মাঝে তুলনামূলক পার্থক্য

সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে রয়েছে কিছু মৌলিক পার্থক্য। যেমন: সংস্কৃতি একটি জীবন প্রণালী অপরদিকে সংস্কৃতির প্রতিফলনই হচ্ছে সভ্যতা। সংস্কৃতি প্রধানত অবস্তুগত সৃষ্টি, সভ্যতা হল বস্তুগত সৃষ্টি। মৌলিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে সংস্কৃতি আর সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে সভ্যতা। সংস্কৃতি হল মানুষের ভেতরের আচরণ আর সভ্যতা হলো মানুষের বাহিরের আচরণ। সংস্কৃতি দ্বারা মানুষের রুচিবোধ ও রীতিনীতি বোঝায়। সভ্যতার দ্বারা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণবিকাশ বোঝায়। সাধারণত সংস্কৃতি সমভাবাপন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে বিস্তার লাভ করে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সভ্যতার অংশীদার হতে পারে।

নিম্নে সংস্কৃতি এবং সভ্যতার মধ্যে আরো কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করা হলো -

১। বস্তুনিষ্ঠ জীবনের প্রয়োজন পূরণ ও সাবলীলতা বিধানে যা কিছু সাহায্যকারী তা সভ্যতা নামে অভিহিত।

কিন্তু মন-মানস ও আত্মার কামনা-বাসনা ও সূক্ষ্ম আবেগ-অনুভূতির বাস্তবায়নের উপায়-উপকরণকেই বলে সংস্কৃতি।

২। বস্তুনিষ্ঠ জীবনের রূঢ় বাস্তব ও প্রকৃত উন্নতির স্তর ও পর্যায়সমষ্টি হচ্ছে সভ্যতা। সকলের পক্ষেই তার মূল্যায়ন সহজ।

অপরদিকে সংস্কৃতি অদৃশ্য ধারণা ও মূল্যমান সমষ্টি, তার মূল্যায়ন অতীব দুরূহ কাজ।

৩। সভ্যতা ক্রম-বিকাশমান ,প্রতি মুহূর্ত উন্নতিশীল। প্রাচীন মতাদর্শের সাথে তার দূরত্ব ক্রম-বর্ধমান। তা নিত্য নতুন দিগন্তের সন্ধানী।

কিন্তু সংস্কৃতি প্রাচীনপন্থী। প্রাচীনতম দৃষ্টিকোন ও মতাদর্শ থেকে নিঃসম্পর্ক হওয়া তার পক্ষে কঠিন।

৪। সভ্যতা দেশের সীমা-বন্ধনমুক্ত বিশ্বজনীন ভাবধারাসম্পন্ন। প্রায় সব চিন্তা বিশ্বাসের লোকদের পক্ষে তা গ্রহণযোগ্য।

অপরদিকে সংস্কৃতির উপর পরিবেশ ও ভৌগলিক বিশেষত্বের ব্যাপক প্রভাব প্রবর্তিত হয়। যেমন মুসলমান, হিন্দু, খৃষ্টান ও বৌদ্ধদের সাংস্কৃতিক মেজাজের ওপর তাদের বিশেষ ধর্মের প্রভাব বিরাজিত। সেই সাথে উপমহাদেশের মুসলমানরা একই ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও সংস্কৃতির দিক দিয়ে দুনিয়ার অন্যান্য দেশের মুসলমানদের থেকে বহুলাংশে ভিন্নতর।

৫। সভ্যতা স্থিতিশীল ও দৃঢ়তাপ্রবণ। তার প্রভাব সহজে নিশ্চিহ্ন হবার নয়।

কিন্তু সংস্কৃতির প্রভাব সহজে বিলীন হবার ঝুঁকি বিদ্যমান।

৬। সভ্যতা মানুষের বাহ্যিক জীবন নিয়ে আলোচনা করে। বস্তুগত প্রয়োজনাবলীই তার আলোচ্য বিষয়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, উদ্ভাবনী ও বিভিন্ন শৈল্পিক দুর্লভ উপকরণ ও প্রতিষ্ঠানাদি এক দেশ ও জাতি থেকে ভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে চলে যেতে পারে। অনুন্নত জাতিগুলোও তা থেকে উপকৃত হতে পারে। স্বভাবগত পার্থক্য তার পথে বাধা হতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তিই তা ব্যবহার করে কল্যাণ লাভ করতে পারে। তার কল্যাণ লাভে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। বাছাই প্রক্রিয়াও এখানে অচল।

কিন্তু সংস্কৃতি সাধারণত এক বংশ থেকে তারই পরবর্তী বংশের উত্তরিত হয়। তা সম্যকভাবে অর্জিত হয় না। বাছাই প্রক্রিয়া এখানে পুরোপুরি কার্যকর। কেবলমাত্র বিশেষ পরিমণ্ডলের লোকদের পক্ষেই তার কল্যাণ লাভ করা সম্ভব।

৭। সভ্যতা অর্জন করা অপেক্ষাকৃত সহজ কাজ। সেখানে তেমন কোনো বাধার সম্মুখীন হতে হয় না। জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অতি অল্প সময়ের মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে আপন করে নিয়েছে। কিন্তু এ কার্যক্রমের ফলে তার সাংস্কৃতিক কাঠামো খুব দ্রুত প্রভাবিত হতে পারেনি। উপমহাদেশের জনগণের ওপর ইংরেজের শাসন কার্যের ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবে এখানকার সভ্যতার উপকৃত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানকার সংস্কৃতি তার আসল চরিত্র বা রুপারেখা হারায়নি।

মোটকথা, আমরা যা ভাবি, চিন্তা করি, বিশ্বাস করি তাই সংস্কৃতি। হৃদয়ানুভূতি, চিত্তবৃত্তি, আবেগ, উচ্ছ্বাস ও মানসিক ঝোক-প্রবণতার সাথে তার নিবিড় সম্পর্ক। কেননা এগুলো মানুষের মধ্যে স্বভাবগত ও প্রকৃতিগতভাবেই বর্তমান। মানব-প্রকৃতি তার সাথে নিঃসম্পর্ক হতে পারে না কখনোই। সভ্যতায় রয়েছে মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনাবলীর প্রশ্ন। মানব জীবন যদি শিল্পকারখানা ছাড়াই অবাধে চলতে পারে এবং তার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা হতে থাকে, তাহলে তার জন্য সামান্যতম কাতর হওয়ারও কোনো প্রয়োজন বোধ হবে না।

সভ্যতা ও সংস্কৃতি অনেক ক্ষেত্রে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু ঢালাওভাবে এটা ঠিক নয়। তবে এ দুটির মাঝে সাদৃশ্য অনস্বীকার্য।

মোটরগাড়ি সভ্যতার উৎপাদন, সংস্কৃতি তাতে সৌন্দর্য, শোভনতা ও চিত্তবিনোদনমূলক কারুকাজ ও সুক্ষ্ম উপকরণাদি বৃদ্ধি করেছে। সভ্যতা আকাশচুম্বী প্রাসাদ নির্মাণ করেছে; সংস্কৃতি সে প্রাসাদকে সুদৃশ্য, মহিমামন্ডিত ও বিস্ময়কর প্যাটার্নে সুশোভিত করে দিয়েছে।

বস্তুত সভ্যতা ও সংস্কৃতি দুটি মানব জীবনের মৌল প্রয়োজন। যে জাতির জীবনে একসঙ্গে দুটিরই সমন্বয় ঘটেনি, তার উন্নতি অসম্ভব। সভ্যতা একটি জাতিকে বস্তুনিষ্ঠ শক্তিতে মহিমাময় করে আর সংস্কৃতি তাকে গতিবান করে। মানব সভ্যতার আধুনিক পর্যায়ে এ দুটির মাঝে গভীর একাত্মতা বিদ্যমান। তাই সভ্যতার অর্থে সংস্কৃতি বা

সংস্কৃতি অর্থে সভ্যতাকে গ্রহণ করা কিছু মাত্র অশোভন নয়। সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণ এভাবেই পূর্ণ পরিণতি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে বললেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবে না।

ধর্মের সাথে সংস্কৃতির সম্পর্ক

একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যাবে যে, ধর্মকে যতই অস্বীকার করা হোক না কেন, ধর্ম ও ধর্মীয় ভাবধারা মানুষের রক্ত মাংসের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে, গভীরভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে - থাকবেও চিরকাল। এ থেকে মানুষের মুক্তি নেই। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, জ্ঞান-গবেষণা এবং চিন্তা ও কল্পনার চরম উৎকর্ষ সত্ত্বেও তাকে এমন সব অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় যখন ধর্মের প্রভাব অকপটে স্বীকার না করে কোন উপায় থাকে না। এমন কি কট্টর নাস্তিকও এমন সব অবস্থায় ধর্ম ও ধর্মীয় ভাবধারাকেই একমাত্র আশ্রয়রূপে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

প্রসঙ্গত একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে যা বেশ কিছু বছর পূর্বে সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিলঃ একটি রুশ সামুদ্রিক জাহাজ সাগরে প্রবল ঝড়ের দাপটে টালমাটাল। এক্ষুনি বুঝি জাহাজটি ডুবে যাবে, কোথাও আশার আলো চোখে পড়ছে না। এই সমুদ্র উপকূলের কোথাও কোনো উপসাগরের অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছিল না। হঠাৎ প্রবল ঝড়ে নাস্তানাবুদ জাহাজ খানি পথ হারিয়ে এক শান্ত স্থির পোতাশ্রয়ে ঢুকে পড়লো। সমুদ্রের প্রবল বাতাস, উন্মত্ত গর্জন যেন কোন এক জাদু মন্ত্র বলে শান্ত হয়ে গেল। জাহাজের নাবিকেরা আনন্দে চিৎকার করে উঠলোঃ 'না-খোদা' (রুশ ভাষায় এর শব্দটির মানে দাঁড়ায় খোদা প্রেরিত।)

এ ঘটনাটি যেন কুরআনেরই প্রতিধ্বনিঃ

মানুষ সমুদ্র সফরের জন্য বড় বড় জাহাজ নির্মাণ করে মহাসাগরে অথৈ পানিতে ভাসিয়ে দেয়। তাকে চালু করতে ও থামিয়ে দিতে সে সম্পূর্ণ সক্ষম। কিন্তু প্রচন্ড ঝড়-তুফানের মুখে মানুষ একেবারে অক্ষম ও অসহায়। তাকে সকল শক্তি-ক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা অনিবার্যভাবে স্বীকার করে নিতে হয়। মানুষ ক্ষেতে খামারে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে রক্তকে পানি করে দেয়। সমস্ত ক্ষেত খামার সবুজ শ্যামলে ফল ফসলের গুচ্ছে একাকার হয়ে যায়। তা দেখে তার চোখ জুড়ায়, সোনালী ভবিষ্যতের উজ্জ্বল

আশায় বুক ভরে ওঠে। কিন্তু হঠাৎ এমন ঘটনা ঘটে যায় যার ফলে সমস্ত ক্ষেত খামার জ্বলে পুড়ে শূন্য মাঠে পরিণত হয় কিংবা বন্যার পানিতে সব ডুবে নষ্ট হয়ে যায়, ফলে তার সব আশা মাটি হয়ে যায়। কিন্তু কেন ঘটল এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনা, এমন দুরবস্থা। মানুষ নিজ থেকে এর কোন জবাবই পেতে পারে না। বাহ্যিক কার্যকারণ যাই থাক না কেন এ দুরবস্থার অন্তর্নিহিত আসল কারণ মানুষ শুধুমাত্র ধর্মের কাছ থেকেই যা জানতে পারে। তাই মানুষ যখন জীবনের তিক্ত বাস্তবতা আস্বাদন করে দিশাহারা হয়ে পড়ে, তখন ধর্ম এসে তাকে সান্ত্বনা দেয়, অসহায়ের সহায় হয়ে দাঁড়ায় এই ধর্মবিশ্বাস।

বস্তুত জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের সব আবেগ-অনুভূতি, ব্যথা-বেদনা ও দাবি-দাওয়ার সত্যিকারের জবাব হচ্ছে এই ধর্ম। জীবনের গতিধারাকে ধর্ম ও নৈতিকতার নিয়ম নীতি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করতে মানুষ বাধ্য হয়। মানুষের সমস্ত চালচলনকে নিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালিত করার ব্যাপারে ধর্ম একটি সক্রিয় শক্তি হিসেবে কাজ করে। এ শক্তি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত করে তোলে, আর এভাবেই সংস্কৃতির প্রশ্নে ধর্মের গুরুত্ব অনস্বীকার্য হয়ে ওঠে। সমাজবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক জীবনকে সুবিন্যস্ত করে তোলে, তার মধ্যে জাগিয়ে দেয় এক গভীর ও সূক্ষ্ম আবেগ। এ হৃদয়াবেগই হল সংস্কৃতির উৎসমূল, আর এ কারণেই মানব জীবনে ধর্মের সাথে সংস্কৃতি কিংবা সংস্কৃতির সাথে ধর্মের আলোচনা অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

ধর্মের প্রেরণায় সংস্কৃতি হয় পরিপুষ্ট, সুদৃঢ়ভিত্তিক, স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন ও অশ্লীলতামুক্ত। তার শিকড় হয় মানুষের মন-মগজ, স্বভাব চরিত্র ও আচরণের গভীরে বিস্তৃত ও প্রসারিত।

ধর্ম জীবনের একটা দিকমাত্র হলে তা সংস্কৃতির সমার্থবোধক হয়ে যায় আর তার একটা অংশও। ধর্ম যদি মানুষের সমগ্র জীবনকে শামিল করে, তাহলে সংস্কৃতি ধর্মের একটা অংশ হবে। কেননা ধর্ম মানুষের চিন্তা ও কর্ম উভয়ক্ষেত্রে হয়ে থাকে আর সংস্কৃতির আওতা হচ্ছে শুধু চিন্তাগত বিকাশ ও উৎকর্ষ। ধর্মের এ ব্যাপক ও

পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা অপর কোন ধর্ম সম্পর্কে সত্য হোক আর না-ই হোক, ইসলাম সম্পর্কে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

এজন্য কুরআন মাজীদে ইসলামকে ‘দ্বীন’ বলা হয়েছে, আর ‘দ্বীন’ হচ্ছে সমগ্র জীবনের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ বিধান। মানব জীবনের সবকিছুই তার মধ্যে শামিল রয়েছে, জীবনের এমন কোন একটি দিক নেই যা এর বাইরে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেনঃ

اِنَّ الدِّیۡنَ عِنۡدَ اللّٰہِ الۡاِسۡلَامُ

“নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন হল ইসলাম”

(সূরা আল ইমরান: ১৯)

دِیۡنًا قِیَمًا مِّلَّۃَ اِبۡرٰہِیۡمَ حَنِیۡفًا ۚ وَ مَا کَانَ مِنَ الۡمُشۡرِکِیۡنَ ﴿۱۶۱﴾

“এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন, ইবরাহীমের মিল্লাত (আদর্শ), তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।”

(সূরা আল আনআম: ১৬১)

বস্তুত ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান মানব জীবনের এ বিশাল ও বিস্তৃত ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শনের জন্য চিন্তার দিক হলো সংস্কৃতি। ইসলাম সভ্যতা ও সংস্কৃতি, তাহজিব ও তামাদ্দুন, উভয় দিকেরই সমন্বয়। এ কারণেই ইসলামের মনীষীগণ ইসলামী সংস্কৃতি ও ইসলামী সভ্যতা - এ দুটি পরিভাষাই ব্যবহার করেছেন, কেননা এ দুটি দিকই ইসলামের অন্তর্ভুক্ত।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতি

পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বা পশ্চিমা সংস্কৃতি হল সামাজিক নিয়ম, নৈতিক মূল্যবোধ, ঐতিহ্যগত রীতিনীতি, বিশ্বাস ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, শিল্পকর্ম এবং পশ্চিমা বিশ্বের প্রযুক্তির ঐতিহ্য। এটি পশ্চিমা সভ্যতা, অক্সিডেন্টাল কালচার বা পশ্চিমা সমাজ নামেও পরিচিত। শব্দটি ইউরোপের বাইরের দেশ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাদের ইতিহাস ইউরোপের সঙ্গে অভিবাসন, উপনিবেশ বা প্রভাব দ্বারা দৃঢ়ভাবে যুক্ত। পশ্চিমা সংস্কৃতি গ্রিকো-রোমান সংস্কৃতি, জার্মানিক সংস্কৃতি ও খ্রিস্টান সংস্কৃতি দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দার্শনিক ভিত্তি হচ্ছে - এই জীবনটা কতগুলো মৌলিক উপাদানের আপতিক বা দুর্ঘটনামূলক সংমিশ্রণে অস্তিত্ব লাভ করেছে। তার মূলে কোন উদ্দেশ্য নেই, তার লক্ষ্য পরিণতি বলতেও কিছু নেই। এসব উপাদানের বিশ্লিষ্ট ও বিক্ষিপ্ত হওয়ারই নাম মৃত্যু। এই মৃত্যুর পর আর কোন জীবন অকল্পনীয়। জীবন একটা দুর্ঘটনা মাত্র, তাই দুনিয়ায় নেই কোন শাশ্বত মূল্যবান - নেই কোন দায়-দায়িত্ব, কোন প্রতিশোধ বিধান।

এই চিন্তা দর্শনে ব্যক্তি ও জাতির পক্ষে যা কল্যাণকর, তাই ভালো। অন্য ব্যক্তি বা জাতির জীবন শিরা যদি তাতে ছিন্ন-ভিন্নও হয়ে যায়, তবুও তা ভালো। পক্ষান্তরে ব্যাক্তি ও জাতির পক্ষে যা-ই ক্ষতিকর, তা-ই মন্দ, তাতে অন্যান্য মানুষের বা জাতিসমূহের যতই কল্যাণ নিহিত থাক না কেন।

এক কথায় পাশ্চাত্য সংস্কৃতি সম্পূর্ণ স্বার্থবাদী দর্শনের উপর ভিত্তিশীল। এ কারণে দুনিয়ার বিভিন্ন ব্যক্তি ও জাতির মধ্যে কঠিন দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ বিগ্রহ তার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে দেখা যায়। পাশ্চাত্য সমাজের ভাঙ্গন ও বিপর্যয়ই সাধারণ দৃশ্য। সেখানে

শাসক ও শাসিত, বিজয়ী ও বিজিত, মালিক ও শ্রমিক এবং শোষক ও শোষিত শ্রেণীগুলোর মধ্যে সংঘাত মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে স্বাভাবিকভাবেই।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির স্বরূপ

ধর্মের প্রতি আস্থাহীনতা থেকে সৃষ্ট পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের মূল উদ্দেশ্যই মানুষের কামনা-বাসনার সন্তুষ্টি, বস্তুবাদ দর্শন।। তাদের সংস্কৃতির অংশ হিসেবে উদযাপিত দিবসসমূহ, আনুষ্ঠানিকতা, নিয়ম নীতি সবকিছু মূল প্রাচীন গ্রীক ও খ্রিস্টধর্ম থেকে উৎসারিত হলেও পরবর্তীতে মানুষের চাহিদা, ইচ্ছা ও সংখ্যাগরিষ্ঠের চাপে পরিবর্তিত রূপ ধারন করেছে। বর্তমানে নফসের দাসত্বের প্রকট শক্তিশালী প্রভাবে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির নামে যে অপসংস্কৃতি প্রচলিত রয়েছে, তা নিজস্ব পরিমন্ডল ছাড়িয়ে প্রাচ্যে এমনকি মুসলিমদের মাঝেও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। এমনকি নিজস্ব ইসলামী সংস্কৃতির প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে হীনমন্যতায় ভোগা প্রজন্ম পাশ্চাত্যের অপসংস্কৃতিকে সাদরে গ্রহনই শুধু করেনি বরং রীতিমত উদযাপনও করছে আনন্দের সাথে।

অথচ অপসংস্কৃতির করাল গ্রাসে বর্তমান প্রজন্ম ডুবে যাচ্ছে অশ্লীলতা, বেহায়াপনায়, হয়ে পড়ছে শিকড়হীন পরগাছার মত।

পাশ্চাত্যের আকর্ষণীয় দৃষ্টিনন্দন ও মানুষের কাছে গ্রহনযোগ্য করার চেষ্টায় শব্দজাদুতে আচ্ছাদিত সংস্কৃতির ভেতরের স্বরূপটা তাই আমাদের জানাটা অত্যন্ত জরুরী।

পাশ্চাত্যের ধোঁকা: বাকস্বাধীনতা

প্রখ্যাত ব্রিটিশ লেখক জর্জ অরওয়েল বলেছিলেন,

“স্বাধীনতা হলো মানুষ যা শুনতে চায় না তা বলার অধিকার।”

পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই আলাদা মস্তিষ্কের অধিকারী। প্রত্যেক মানুষের আলাদা চিন্তাভাবনা রয়েছে, তাদের প্রভাবিত হওয়ার ধরনও আলাদা। ফলে, পৃথিবীর সবার মতামত ও চিন্তাভাবনা এক না হওয়াই স্বাভাবিক। মানব ইতিহাসে অনেক আগে থেকেই মানুষ একে অপরের চিন্তাভাবনার বিরোধিতা করে এসেছে। নিজের মতামত প্রকাশ করা কোনো সমস্যা নয়, সমস্যা হলো নিজের মতামত অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া, বা অন্যকে তার চিন্তাভাবনা প্রকাশে বাধা দেওয়া, কিংবা নিজের পছন্দ নয় এমন মতামত প্রকাশ না করতে অন্যকে বাধ্য করা।

সবাই নিজের বাকস্বাধীনতায় বিশ্বাস করে।কিন্তু কেউ কি আর নিজের মতের বিরোধী কোনো কথা শুনতে চায়? এটা প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য সব জায়গায় একইরকম। তবে পার্থক্য রয়েছে প্রতিক্রিয়ায়। একেক অঞ্চলে একেকভাবে প্রতিক্রিয়া দেখানো হয়। পশ্চিমা বিশ্ব মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও চিন্তার স্বাধীনতার জন্য বেশ বিখ্যাত। আমরা, তথা প্রাচ্যের অধিকাংশ মানুষ ভাবি, সেখানে যে কেউ ইচ্ছেমতো যা খুশি বলতে পারে। সেখানে মানুষ সবকিছুর সমালোচনা করতে পারে, কেউ কোনো বাধা দেবে না,

বরং আপনাকে সুযোগ করে দেবে আপনার মত প্রকাশের। বিষয়টা এমন যে- সেখানকার সবাই ভলতেয়ারপন্থী। ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ারের সেই বিখ্যাত উক্তি।

তিনি বলেছিলেন,

"আমি তোমার কথার সাথে বিন্দুমাত্র একমত না হতে পারি, কিন্তু তোমার কথা বলার অধিকার রক্ষার জন্য আমি জীবন দেবো।"

ভলতেয়ারের উক্তিটি শুনতে বেশ ভালো লাগে। নিজের মত প্রকাশের বেলায় সবাই ভলতেয়ারপন্থী, কিন্তু অন্যের মত প্রকাশের বেলায় তা মনে থাকে না। মানুষ ততক্ষণ পর্যন্তই অন্যের মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই মত নিজের চিন্তাভাবনার বিরুদ্ধে যায়। যখনই অন্যের মত নিজের মতের বিরুদ্ধে যায়, তখনই সে প্রতিক্রিয়া দেখায়। পশ্চিমা বিশ্ব অবশ্যই মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বের অন্যান্য দেশ বা অঞ্চলের তুলনায় বেশ উদার। কিন্তু তারাও নিরঙ্কুশ ও শর্তহীন উদার নয়। পশ্চিমা বিশ্বও ভিন্নমত দমিয়ে রাখার চেষ্টা করে। তারা দমিয়ে রাখে বয়কট ও বাতিলের মাধ্যমে। বাকস্বাধীনতাকে দমিয়ে রাখার সেই পশ্চিমা নীতির নাম 'ক্যানসেল কালচার'।

ক্যানসেল কালচার বলতে বোঝায়, সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয় এমন কোনো কার্যক্রম বা দৃষ্টিভঙ্গির কারণে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে প্রকাশ্যে বয়কট, প্রত্যাখ্যান বা অসহযোগিতার ঘটনা ও প্রথা। পশ্চিমারা তাদের সংস্কৃতি, চিন্তাভাবনা ও দর্শনের বিরোধীদের সাধারণত এভাবে বাগে আনে। সাধারণত একজন সেলিব্রিটি বা অন্য সুপরিচিত ব্যক্তিকে ক্যানসেল করা মানে সেই ব্যক্তিকে সমর্থন করা বন্ধ করা। সেটা হতে পারে একজন অভিনেতার চলচ্চিত্র বয়কট করা, বা তার সেই চলচ্চিত্র না দেখতে অন্যকে উৎসাহিত করা, অথবা একজন লেখকের বই আর না পড়া বা প্রচার

না করা। আবার এমনও হতে পারে- কোনো ব্যক্তিকে তার চাকরি থেকে বহিষ্কার করা। এই কালচার অনেক মানুষের ক্যারিয়ার প্রতিনিয়ত ধ্বংস করে চলেছে। ক্যানসেল কালচারের চর্চা এখন মূলধারার গণমাধ্যম ছাড়িয়ে ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রামের মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে ব্যাপকভাবে করা হয়।

পশ্চিমা ক্যানসেল কালচারের বড় ভুক্তভোগী হলো ফিলিস্তিনপন্থীরা। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে ফিলিস্তিনের পক্ষে কথা বললে ক্যারিয়ার ধ্বংসের সম্ভাবনা তৈরি হয়। পশ্চিমা গণমাধ্যমে ইসরায়েল কর্তৃক ফিলিস্তিনিদের উপর অত্যাচার-নিপীড়নের খবর প্রকাশিত হয় না বললেই চলে। উপরন্তু, ফিলিস্তিনপন্থীদের তথাকথিত 'অ্যান্টি-সেমিটিক' আখ্যা দিয়ে বিভিন্নভাবে বয়কট ও হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। হাম্মাম ফারাহ নামক পশ্চিমা বিশ্বে বসবাসরত এক ফিলিস্তিনি বলেন,

“ক্যানসেল হওয়া লোকদের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্যতম ঘটনার শিকার হলো ফিলিস্তিনিরা, এবং যারা আমাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে। যখন ফিলিস্তিনিদের নিজেদের অধিকারের জন্য দাঁড়ানোর কথা আসে, তখন এটা খুবই কঠিন কাজ। আমাদের বাকস্বাধীনতা এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে বার বার আক্রমণ করা হয়েছে।” (সূত্র: দ্য ইনটারসেপ্ট)

পশ্চিমা বিশ্বে ফিলিস্তিনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করাও যেন অপরাধ! ফিলিস্তিনের পক্ষে কথা বললে চাকরি হারানো থেকে শুরু করে সামাজিকভাবে বয়কট হওয়াসহ নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। উদাহরণস্বরুপ বলা যেতে টেসলা, স্পেস এক্স ও টুইটারের মালিক পশ্চিমা ধনকুবের ইলন মাস্কের সাম্প্রতিক ইহুদী বিরোধী মন্তব্যের কথা। এক টুইটে তিনি বলেন আমারিকার সমাজে শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে ইহুদীরা বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। একই সাথে তিনি দাবী করেন ফিলিস্তিনি নারী ও শিশুদের হত্যার মাধ্যমেই হামাসেই জন্ম হয়েছে। তার এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে পশ্চিমারা একজোট হয়ে সরব হয়ে ওঠে; টুইটার থেকে বিজ্ঞাপন বন্ধের ঘোষণা দেয় ইউরোপীয়ান কমিশন, অ্যাপল, আই বি এম, ডিজনীসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান।

কোনো জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা বিশ্বাসকে অপমান কিংবা ছোট করার ফলে যদি কাউকে বয়কটের ডাক দেওয়া হয়, তবে সেটা শর্তসাপেক্ষে মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু শুধুমাত্র তথাকথিত ‘সমাজে অগ্রহণযোগ্য’ মতামত প্রকাশের ফলে যদি এমন হয়, তবে তা অবশ্যই বাকস্বাধীনতাকে অস্বীকার করার নামান্তর। ক্যানসেল কালচারের মাধ্যমে অনেক সময় পশ্চিমাদের দ্বিচারিতাও প্রকাশ পেয়ে যায়। ফ্রান্সসহ পশ্চিমা বিশ্বে যারা হলোকাস্ট অস্বীকার করে তাদের শাস্তি দেওয়া হয়। সেখানে জায়োনিজমের বিরোধিতা

করাকে এবং ইসরায়েল কর্তৃক ফিলিস্তিনিদের উপর অত্যাচারের সমালোচনা করাকে ‘এন্টি-সেমিটিক’ বলে আখ্যা দেওয়া হয়।

একইভাবে অন্যায় কোনো ধর্মের প্রবর্তককে অপমান করা। ফরাসি ম্যাগাজিন শার্লি হেবদো হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে নিয়ে অপমানজনক কার্টুন আঁকলেও তাদের কোনো শাস্তি হয়নি। ফ্রান্সে ইহুদি-বিদ্বেষের ফলে যেমন শাস্তি হয়, ইসলাম-বিদ্বেষের ফলে তেমন শাস্তি হয় না। সেখানে ইহুদি-বিদ্বেষের বেলায় ক্যানসেল কালচার কাজ করলেও ইসলাম বিদ্বেষের বেলায় কাজ করে না। অন্যান্য পশ্চিমা দেশেও একইরকম। ফলে জবাবদিহিতা বলে যে ক্যানসেল কালচারকে সমর্থন করা হয়, সেটা প্রশ্নের মুখে পড়ে যায়।

নৈতিক অবক্ষয়ের সংস্কৃতি

বেশ কয়েক দশক ধরেই পশ্চিমা সমাজ মারাত্মক নৈতিক অবক্ষয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ভেঙে পড়ছে সমাজের সবচেয়ে মূল্যবান ও মৌলিক ইউনিট পরিবার। বাড়ছে ডিভোর্স, পরকীয়া, আর জারজ সন্তান। প্রতিবছর বৈধভাবে হত্যা করা হচ্ছে লক্ষ লক্ষ গর্ভের শিশুকে। চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়ছে মাদকাশক্তি।পর্ন প্রভাবিত সিনেমা আর মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি যৌনতার বিকৃত ধারনা ঢুকিয়ে চলেছে সমাজে। সমকামিতা আর ট্রান্সজেন্ডার মুভমেন্টের মতো বিকৃতিকে শুধু বৈধতাই দেয়া হচ্ছে না বরং রীতিমত উদযাপন করা হচ্ছে। ঘুনে খাওয়া সমাজ,ভাঙা পরিবার আর সামাজিক অবক্ষয়ের প্রভাব পড়ছে সন্তানদের মনস্তত্ত্ব, পড়াশোনা ও আর্থিক জীবনে। পরিবার থেকে সমাজ ও জীবনের ব্যাপারে সঠিল দৃষ্টিভঙ্গি শেখার বদলে দশকের পর দশক ধরে লক্ষ লক্ষ শিশু কিশোর বেড়ে উঠছে গভীর মানবীয় বন্ধন স্থাপনে অক্ষম হয়ে - হতাশা, ক্ষোভ,

মাদকাসক্তি আর উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ে। এসবই হচ্ছে পশ্চিমাদের সংস্কৃতির "ব্যক্তি স্বাধীনতা" নামক উপাদানের মোড়কে।

পাশ্চাত্যে নৈতিকতার মানদন্ড হিসেবে গ্রহন করে মানুষের খেয়াল খুশিকে, সেই খেয়াল খুশি হতে পারে একজন স্বৈরশাসকের, গুটিকয়েক নেতার, অথবা সংখ্যাগুরুর বা ব্যক্তির নিজের।

اَرَءَيۡتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ ؕ اَفَاَنۡتَ تَكُوۡنُ عَلَيۡهِ وَكِيۡلًا ۙ
اَمۡ تَحۡسَبُ اَنَّ اَكۡثَرَهُمۡ يَسۡمَعُوۡنَ اَوۡ يَعۡقِلُوۡنَ ؕ اِنۡ هُمۡ اِلَّا كَالۡاَنۡعَامِ بَلۡ هُمۡ اَضَلُّ
سَبِيۡلًا ٤٤

"তুমি কি দেখনি তাকে, যে তার প্রবৃত্তিকে নিজের ইলাহরূপে গ্রহন করেছে? তবুও কি তুমি তার জিম্মাদার হবে? তুমি কি মনে করো যে, তাদের অধিকাংশ লোক শোনে অথবা বোঝে? তারা কেবল পশুদের মতো বরং তারা আরং অধিক পথভ্রষ্ট।"

(সূরা আল ফুরক্বানঃ ৪৩, ৪৪)

মানুষের খেয়াল খুশি এবং কামনা বাসনা প্রায় প্রতিনিয়ত বদলাতে থাকে। এর কোনো স্থিতিশীলতা, তাল-লয়-মাত্রা নেই। তাই এগুলোর ভিত্তিতে গড়ে ওঠা মূল্যবোধ, নৈতিকতা এবং আদর্শও বদলাতে থাকে ক্রমাগত। এক যুগের অসুস্থতা আরেক যুগের আবশ্যিকতা হয়ে দাঁরায়, এক সময়ের অন্যায় অন্য সময়ে পরিণত হয় বৈধ কিংবা প্রশংসনীয় কাজে। কোনো সমাজকে যখন সহজাত নৈতিকতা এবং অন্তর্নিহিত ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয় তখন দুটো ব্যাপার ঘটে।

অতি দ্রুত এবং অনিশ্চিত গতিতে ভালোমন্দের সংজ্ঞা বদলায় এবং পর্যায়ক্রমে সমাজ এগিয়ে যায় নৈতিক অবক্ষয় ও অধঃপতনের দিকে।

সেকুলারিজম কালচার

ইউরোপে তথা পাশ্চাত্যে সামাজিক সংস্কৃতির মৌলিক উপাদান ধর্ম কে তারা সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করে যুক্তি দিয়ে। সেই সকল যুক্তি, পর্যবেক্ষণ ও তাদের দাবিতে নিরেট তথ্যের প্রমান সাপেক্ষে গড়ে ওঠে সেকুলারিজম এর বীজ।

বিশ্বাসের বদলে কেবল নিজস্ব সীমাবদ্ধ জ্ঞানে ধর্মকে আবদ্ধ করে তারা খুজতে থাকে ধর্মের বিকল্প। সমাজ ও রাষ্ট্রে ধর্ম ও ধর্মের প্রভাবকে সীমাবদ্ধ করতে শিকড় ছড়ায় সেকুলারিজম। ধর্মের জায়গায় সেক্যুলার দর্শনকে বসিয়ে উপস্থাপন করা হয় কুসংস্কারের ওপর যুক্তির বিজয় হিসেবে। এখানে যুক্তি মানে " বিজ্ঞান " আর কুসংস্কার মানে " ধর্ম"। যখন ধর্মকে উপস্থাপন করা হয় যুক্তির সাথে সাংঘর্ষিক ও নিম্নশ্রেনীর হিসেবে তখন স্বাভাবিকভাবেই তা মানুষের বিশ্বাসের ভিতে আঘাত করে।

পশ্চিমে তৈরি হওয়া বিশ্বাসের সংকটের কারন ছিল ক্যাথলিক চার্চের ওপরতলার লোকেদের আদর্শিক দেউলিয়াত্ব।একের পর এক দূর্নীতিপরায়ন পোপ, তাদের অসুস্থ বিলাসিতা, অনৈতিকতা, চার্চের মাধ্যমে টাকা নিয়ে "গুনাহ মাফ করা", রক্ষিতার গর্ভে জন্ম নেয়া জারজ সন্তানদের প্রকাশ্যে বৈধতা দেয়ার মতো বিভিন্ন ঘটনা জন্ম দেয় এক

চরম সংকটের, যাকে অনেকে ইউরোপের ইতিহাসে “সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা” বলে থাকেন এ সংকটের গর্ভ থেকে জন্ম নেয় ক্রিশ্চিয়ানিটির প্রোটেস্ট্যান্ট ধারা।

নিজেদের বিশ্বাসকে রক্ষা করতে প্রোটেস্ট্যান্টরা ক্যাথলিক চার্চ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।প্রোটেস্ট্যান্টরা আবার বিভক্ত হয়ে পড়ে নানা দল উপদলে। এ দলগুলো একইসাথে নিজেদের মধ্যে এবং ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে শুরু করে। ক্রিশ্চিয়ানিটির নামে চলা এদের পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, ধ্বংস, জুলুম, অবিচার ইত্যাদির কারনে ইউরোপিয়ানদের মনে বদ্ধমূল ধারনা তৈরি হয় যে, ধর্মের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র টিকিয়ে রাখা সম্ভব না। এমনকি ধর্মীয় নেতারাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়, সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য এমন কিছু মৌলিক নীতি প্রয়োজন যেগুলোর ব্যাপারে সমাজের সবাই একমত হবে। ইউরোপের সেক্যুলার চিন্তার উত্থানের পেছনে মূল চালিকাশক্তি ছিল এই নীতি - ধর্মীয় মূলনীতির বদলে সমাজ তৈরি হবে যুক্তি ও বাস্তবিক জ্ঞানের মাধ্যমে।

ধর্ম ও স্রষ্টাকে অস্বীকারের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠা পশ্চিমাদের সেকুলারিজম সংস্কৃতি। যা ইসলামের মূল বিশ্বাস আল্লাহকে স্রষ্টা হিসেবে মানা, তার বিধানমত চলার সাথে স্পষ্ট সাংঘর্ষিক।

সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতি

- ### থার্টি ফার্স্ট নাইট

উৎপত্তি: প্রাচীন পারস্যের পরাক্রমশালী সম্রাট জামশিদ খ্রিষ্টপূর্ব ৮০০ সালে নববর্ষ প্রবর্তন করেন। পরবর্তীতে ব্যাবিলনের সম্রাট জুলিয়াস সিজার খ্রিষ্টপূর্ব ৪৬ সালে ইংরেজি নববর্ষ প্রচলন করেন। প্রথমদিকে নববর্ষ বিভিন্ন তারিখে পালন করা হতো।

পরবর্তীতে ১৫৮২ সালে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার প্রবর্তনের পর পহেলা জানুয়ারিতে নববর্ষের দিন হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়। বাংলাদেশে থার্টি ফার্স্ট নাইটের ব্যাপক প্রচলন ঘটে ২০০০ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর মধ্যরাতের মিলেনিয়াম বা সহস্রাব্দ পালনের মধ্য দিয়ে। (সূত্র: ইন্টারনেট)

ডিসেম্বর মাসের ৩১ তারিখ দিবাগত রাতকে থার্টিফার্স্ট নাইট বলা হয়। বর্ষবরণের নামে এ রাতকে ঘিরে পশ্চিমাদের যে কত আয়োজন তার কোনো শেষ নেই।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় হল, আজ মুসলমানরাও এ আয়োজনে পিছিয়ে নেই। আতশবাজি, পটকাবাজি, গান, বেহায়াপনা, অশ্লীলতা, মাদক সেবন, নারীর শ্লীলতাহানী, যেনা- ব্যভিচারসহ কত কিছুইনা হচ্ছে এ রাতে।

এ সব কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের অনুসরণ ছাড়া অন্য কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না।

আমাদের দেশে থার্টি ফার্স্ট নাইটে অসামাজিক কার্যকলাপ বহুগুণে বেড়ে যায়। নেশাদ্রব্য, আপত্তিকর নাচ-গানসহ বিভিন্ন বেহায়ামিপূর্ণ কীর্তিকলাপ দ্বারা থার্টি ফার্স্ট উদযাপন গত কয়েক বছর ধরেই বাংলাদেশে চলে আসছে।

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কয়েক দশক আগেও এ দিবসটি এভাবে উদযাপন করা হতো না। কিন্তু ভিনদেশের সংস্কৃতিতে আজ এ দিবসগুলোতে শরীয়ত বিরোধী ও গোনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে ঈমানদাররা তাদের ঈমান-আমলকে বিনষ্ট করছেন।

মূলত এটা খৃস্টানদের সংস্কৃতি হলেও প্রতি বছর অনেক মুসলিমও পালন করে থাকেন। কিন্তু এটা করতে গিয়ে আমরা অনেক সময় উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ি, শরীয়তের

সীমালঙ্ঘন করে ফেলি। অশ্লীলতা ও নোংরামীতে লিপ্ত হয়ে পড়ি। এটা মুসলমানদের কোন সভ্যতা, সংস্কৃতি হতে পারে না।

বরং এটা একটি অপসংস্কৃতি। থার্টি ফার্স্ট নাইট বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণ এবং অশ্লীলতার মহাপ্লাবন। এটি সম্পূর্ণ বিজাতীয় সংস্কৃতি। একজন ঈমানদার মুসলমান ও রুচিশীল-সচেতন মানুষ কিভাবে বিজাতীয় সংস্কৃতি ও বেহায়াপনাকে সমর্থন করে তা বোধগম্য নয়।

আল্লাহতায়ালা বলেন,

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

“তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে থাক যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।“

(সুরা আলে-ইমরান: ১৩১)

- **ভ্যালেন্টাইন ডে:**

ভালবাসা দিবস-এর ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে এনসাইক্লোপিডিয়া সহ আরো বহু রেফারেন্স থেকে জানা যায়, "রোমান এক খ্রিস্টান পাদ্রি সেন্ট ভ্যালেন্টাইন। চিকিৎসা বিদ্যায় সে ছিলো অভিজ্ঞ। খ্রিস্টধর্ম প্রচারের অভিযোগে ২৭০ খ্রিস্টাব্দে রোমের সম্রাট দ্বিতীয় ক্লডিয়াসের আদেশে ভ্যালেন্টাইনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। সে যখন বন্দি ছিলো তখন তরুণ-তরুণীরা তাকে ভালবাসা জানিয়ে জেলখানায় জানালা দিয়ে চিঠি ছুড়ে দিতো। বন্দি অবস্থাতেই সেন্ট ভ্যালেন্টাইন জেলারের অন্ধ মেয়ের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেয়ার চিকিৎসা করে। মেয়েটির সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে উঠে। মৃত্যুর আগে মেয়েটিকে লেখা এক চিঠিতে সে লিখে যে, "ফ্রম ইউর ভ্যালেন্টাইন।" অনেকের মতে, সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের নামানুসারেই পোপ প্রথম জুলিয়াস ৪৯৬ খ্রিস্টাব্দে ১৪ ফেব্রুয়ারিকে 'সেন্ট ভ্যালেন্টাইন ডে' হিসেবে ঘোষণা দেয়।

বর্ণিত ইতিহাস দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, তথাকথিত ভালবাসা দিবস কখনোই এদেশীয় অর্থাৎ বাঙালি সংস্কৃতির অংশ ছিলো না। আর মুসলমানদের সংস্কৃতিতো নয়ই। বরং তা সম্পূর্ণরূপেই বিজাতীয়, বিধর্মীয় তথা, পশ্চিমা ইহুদী-নাছারাদের প্রবর্তিত নিয়মনীতি, তর্জ-তরীক্বা যা অনুসরণ করা মুসলমানদের জন্য কাট্টা হারাম ও শক্ত কবীরা গুনাহ। এছাড়া তথাকথিত ভালবাসা দিবসের নামে মূলত চলে বেপর্দা-বেহায়াপনার নির্লজ্জ উৎসব। যাতে ইবলিস শয়তানের ওয়াসওয়াসা থাকে ও নফস বা প্রবৃত্তির উদ্দামতা যুক্ত হয়।

وَ لَا تَقۡرَبُوا الزِّنٰۤی اِنَّهٗ کَانَ فَاحِشَۃً ؕ وَ سَآءَ سَبِیۡلًا ﴿۳۲﴾

"তোমরা অবৈধ যৌন সংযোগের নিকটবর্তী হয়োনা, ওটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।"

(সূরা আল ইসরা: ৩২)

- **হ্যালোইন উৎসব**

“হ্যালোইন” বা “হ্যালোউইন” শব্দের অর্থ “শোধিত সন্ধ্যা” বা “পবিত্র সন্ধ্যা”। মূলত: এই উৎসবটি এক অন্ধকারাচ্ছন্ন কুসংস্কার এবং ভ্রান্ত বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত

গবেষকদের মতে, হ্যালোইনের রাত নিয়ে অনেক ধরনের মিথ বা পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। যেমন:

◈ বলা হয়, প্রায় ২০০০ বছর আগে বর্তমান আয়ারল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও উত্তর ফ্রান্সে বসবাস করতো কেল্টিক জাতি। তাদের ধারণা ছিল, অক্টোবরের শেষ দিনের রাত সবচেয়ে খারাপ। যে রাতে সব প্রেতাত্মা ও অতৃপ্ত আত্মারা মানুষের ক্ষতি করতে পারে। আর তাই কেল্টিক জাতির সদস্যরা এই রাতে বিভিন্ন ধরনের ভূতের মুখোশ ও কাপড় পড়তো। তারা নির্ঘুম রাত কাটাতে আগুন জ্বালিয়ে মুখোশ পরে বৃত্তাকারে একসঙ্গে ঘুরতেন ও মন্ত্র জপতো। আর সময়ের পরিক্রমায় কেল্টিক জাতির ‘সাহ-উইন’ উৎসবই বর্তমানে ‘হ্যালোইন’ উৎসব হিসেবে পালিত হচ্ছে।

◈ কারো কারো মতে, এই রাতে দেবতা সামান সব মৃত আত্মাদের পৃথিবীতে আহ্বান জানান। উড়ন্ত ঝাড়ুতে করে হ্যালোইন ডাইনি উড়ে বেড়ায় আকাশ জুড়ে। কখনো বা তিনি কড়া নাড়েন বিভিন্ন বাড়ির দরজায়।

◈ উইকিপিডিয়া বাংলায় বলা হয়েছে, আইরিশ, যুক্তরাজ্য, ওয়েলস সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশ্বাস করতো যে প্রত্যেক নতুন বছরের আগের রাতে (৩১শে অক্টোবর) সাহেইন, মৃত্যুর দেবতা, আঁধারের রাজ পুত্র, সব মৃত আত্মা ডাক দেয়। এই দিন মহাশূন্য এবং সময়ের সমস্ত আইনকানুন মনে হয় স্থগিত করা হয় এবং জীবিতদের বিশ্ব যোগদান করতে মৃত আত্মাদের অনুমোদন করে। তারা আরও বিশ্বাস করতো যে মৃত্যুর কারণে তারা অমর যুবক হয়ে একটি জমিতে বসবাস করতো এবং আনন্দে ডাকা হতো "Tir nan Oge"। মাঝে মাঝে বিশ্বাস করতো যে স্কটল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ড অঞ্চলের ছোট পাহাড়ে কখনো কখনো মৃতরা পরীদের সাথে থাকে। একটি লোককাহিনী থেকে বর্ণিত আছে যে সমস্ত মৃত ব্যক্তিরা ৩১শে অক্টোবর রাত্রিতে জীবিতদের বিশ্বে আসে আগামী বছরের নতুন দেহ নেওয়ার জন্য। এজন্য গ্রামবাসীরা এই খারাপ আত্মাদের থেকে বাঁচার জন্য ব্যবস্থা নেয়।"

◈ Banginews-এ বলা হয়েছে, আইরিশ ও স্কটিশ লোকসাহিত্যে হ্যালোইনকে বলা হয়েছে, সুপারন্যাচারাল এনকাউন্টারস হিসেবে। ঐ সময়ের মানুষের বিশ্বাস ছিল যে, সামারের শেষ, শীতের শুরুতে হ্যালোইন সন্ধ্যায় সমস্ত মৃত আত্মীয়-স্বজনের আত্মারা নেমে আসে এই পৃথিবীর বুকে।

◈ উক্ত সোর্সে আরও বলা হয়েছে, "অষ্টম শতাব্দীতে পোপ গ্রেগরীয় ১লা নভেম্বরকে 'অল সেইন্টস ডে' ঘোষণা করেন এবং আগের সন্ধ্যা মানে ৩১শে অক্টোবরকে 'অল-হ্যালোস-ইভ' বা হ্যালুইন নামে অভিহিত করেন।

মানুষের অন্ধ বিশ্বাস ছিল, অল-হ্যালোস-ইভ-এ প্রেতাত্মারা নেমে আসে। তারা আসে মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে। আর তাই এই প্রেতাত্মাদেরকে প্রতিহত করার জন্য জীবিত

স্বজনদের সকলে একসাথে জড়ো হয়ে আগুন জ্বালিয়ে নানা ভঙ্গিতে নৃত্য করতো এবং মৃত স্বজনের রূপ ধরে আসা ভুতকে পালটা ভয় দেখাতো।

এখনকার হ্যালোইন-এর রীতিনীতি কেল্টিক ভাষী দেশগুলোর লোকজ রীতিনীতি ও বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত বলে ধারণা করা হয়; সেসব দেশের কয়েকটি প্যাগান বা পৌত্তলিক ধর্মাবলম্বী আর অন্যান্যগুলো কেলটিক খ্রিস্টধর্ম অবলম্বন করে থাকে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"যে ব্যক্তি অন্য সম্প্রদায়ের (বিধর্মীদের) সাদৃশ্য অবলম্বন করে সে তাদেরই দলভুক্ত।" [সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং-৪০৩১, সহীহুল জামে-আলবানি, হা/২৮৩১

অমুসলিমদের পৌত্তলিকতা ও জাহেলিয়াত পূর্ণ বিশ্বাসও অপসংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ ছাড়া কিছু নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের নীতি-পদ্ধতি পুরোপুরিভাবে অনুসরণ করবে, বিঘতে বিঘতে ও হাতে হাতে, এমনকি তারা যদি তিনি যব (গুইসাপ সদৃশ মরুভূমিতে থাকা এক প্রকার হালাল প্রাণী) গর্তে প্রবেশ করে থাকে তাহলেও তোমরা তাদের অনুসরণ করবে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, পূর্ববর্তী উম্মত বলতে তো ইহুদি ও খ্রিষ্টানরাই উদ্দেশ্য? তিনি বললেন, তবে আর কারা?" [সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন), অধ্যায়: ৪৯/ ইলম, পরিচ্ছেদ: ৩. ইহূদি ও খৃষ্টানদের রীতি-নীতি অনুসরণ]

পোশাকের স্বাধীনতা

“My body my choice” স্লোগান দেয়া পাশ্চাত্যের ধ্বজাধারীরা নিজেরা স্বল্প বসন, অশ্লীল, কিম্ভুতকিমাকার পোশাক পরার স্বাধীনতা দাবি এবং বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালালেও বিপরীত দিকে ইসলামী সংস্কৃতির নিদর্শন মুসলিম নারীদের পর্দার পোশাকের স্বাধীনতা দিতে রাজি না। তাদের অধিকার ছিনিয়ে নিতে শুধু যে তাদের ওপর ঘৃনাত্মক আক্রমনই করে তা নয় বরং রীতিমত আইন জারি করে তাদের পর্দার পোশাক,হিজাব ও নিকাব পরিধানে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে পশ্চিমাদেশসমূহ। যেমনঃ

ফ্রান্স

ইউরোপের প্রথম দেশ, যেখানে বোরকা আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯৯০এর শেষ নাগাদ মুসলিমদের প্রতি মনোভাবে পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। মুসলিমদের পোশাক পরিচ্ছদ বা যা দিয়ে বাইরে থেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষকে চিহ্নিত করা যায়, তার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ পেতে থাকে।

২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ফরাসি এমপিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে এই আইন পাশ হয়ে যায়। ২০১১ সালের ১১ এপ্রিল এই আইন কার্যকর হয়।

ফ্রান্সে ৫০ লাখ মুসলমানের বাস। বোরকা বা নেকাব পড়লে জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে আইনে।

সুইজারল্যান্ড

দেশটিতে ২০১০ সালের আইন অনুযায়ী উন্মুক্ত স্থানে মুখ ঢেকে রাখা নিষিদ্ধ। এই নিয়মটি রাস্তাঘাট, দোকানপাট ও প্রশাসনিক অধিদপ্তরগুলোর পাশাপাশি গণপরিবহন ও পৌরসভা ভবনগুলোতে প্রযোজ্য।

২০১৪ সালে ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালত কর্তৃক অনুমোদিত এই আইনটি লঙ্ঘন করলে দেশটির হিসেবে দেড়শ ইউরো পর্যন্ত জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়া

অস্ট্রেলিয়াতে উন্মুক্ত স্থানে নিকাব পরার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে ২০১৭ সালের ১ অক্টোবর। এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে দেড়শ ইউরো পর্যন্ত জরিমানা আরোপিত হয়েছে।

তবে অস্ট্রেলিয়ার সাংবিধানিক আদালত ২০২০ সালের শেষের দিকে এমন একটি আইনকে প্রত্যাবর্তন করেছে যেটি পাস হয়েছিল ২০১৯ সালে এবং যে আইনটি নার্সারী ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদেরকে হিজাব পড়তে বাধা প্রদান করেছিল।

বেলজিয়াম

বেলজিয়ামে ২০১১ সালের একটি আইন পাস করে বলা হয়েছিল যে উন্মুক্ত স্থানে এমন পোশাক পরিধান করা যাবে না, যা ব্যক্তির চেহারাকে আংশিক বা পুরোপুরি ঢেকে রাখে। তবে স্বাস্থ্যগত কোনো কারণ থাকলে তা ভিন্ন কথা।

এই আইন লংঘন করলে ১৫ থেকে ২০ ইউরো জরিমানা। পাশাপাশি রয়েছে ৭ দিনের জেল।

বুলগেরিয়া

বুলগেরিয়ায় ২০১৬ সালের একটি আইন পাস করে বলা হয়েছিল যে উন্মুক্ত স্থানে এমন পোশাক পরিধান করা যাবে না, যা ব্যক্তির চেহারাকে আংশিক বা পুরোপুরি ঢেকে রাখে। এই আইন লংঘন করলে দুইশ লিভা তথা প্রায় একশত দুই ইউরো পরিমাণ জরিমানা।

ডেনমার্ক

ডেনমার্কেও রয়েছে উন্মুক্ত স্থানে হিজাব পরার ওপর নিষেধাজ্ঞা। ২০১৮ সালের আগস্টে করা এই নিষেধাজ্ঞা অমান্যকারীদের জন্য রাখা হয়েছে এক হাজার ক্রোনার জরিমানা। যা প্রায় ১৩০ ইউরো পরিমাণ। বারবার আইন লংঘন করলে এটি পৌঁছে যেতে পারে ১০ হাজার ক্রোনার পর্যন্ত।

জার্মানি

অন্যদিকে জার্মানিতে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য হিজাব নিষিদ্ধ না হলেও রয়েছে কাছাকাছি আইন। সেখানে উন্মুক্ত স্থানে হিজাব পড়তে কোনো বাধা না থাকলেও তদন্তের সময় মুখ খুলতে বাধ্য করা হয় মুসলিম নারীদেরকে।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে জার্মানিতে রয়েছে একেক রাজ্যে একেক নিয়ম। কোনো রাজ্যে হিজাবকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে আবার কোনো রাজ্যে বৈধ।

২০১৭ সালে জার্মানির সাংবিধানিক আদালত ওই দেশের নারী শিক্ষকদের উপরে হিজাব সংক্রান্ত একটি নিয়মকে শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এর সুন্দরভাবে পরিচালনার স্বার্থে করা হয়েছে মত দিয়েছে।

নেদারল্যান্ড

নেদারল্যান্ডে ২০১৫ সালে আইন করে বোরকা নিষিদ্ধ করা হয়। বিশেষ করে জনসমক্ষে, অর্থাৎ স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদির মতো জায়গায় বোরকা ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আইনটি কার্যকর হয় ২০১৯ সালের ১ আগস্ট।

এই আইন লঙ্ঘনকারীদের জন্য রয়েছে একসঙ্গে দেড়শ ইউরো জরিমানা।

নরওয়ে

নরওয়েতে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে রয়েছে একই রকমের নিয়ম। ২০১৮ সালের আগস্ট থেকে এই নিয়মটি চালু হয়।

ইতালি

ইতালির দুটি অঞ্চল লোম্বার্ডি এবং ভেনেটোকে হাসপাতাল ও সরকারী প্রতিষ্ঠানে পুরো মুখের ওড়না পরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ব্যক্তি স্বাধীনতা ও লিঙ্গসমতা

পাশ্চাত্যে বর্তমানে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে বিভিন্ন বিকৃত সংস্কৃতি। মানুষের কামনা বাসনাকে লাগামছাড়া হতে দেয়ার সব ধরনের সুযোগ সুবিধাই শুধু দিচ্ছে না পাশ্চাত্য বরং এসব বিকৃত অপসংস্কৃতি পালনের অধিকার দেয়া হচ্ছে রীতিমত আইন করে। যেমন: LGBTQ(নারী-পুরুষ সমকামীতা, উভকামীতা, রূপান্তরকামীতা) কে সমাজে পূর্বে ঘৃনার চোখে দেখা হত। এ ধরনের অস্বাভাবিক বিকৃত যৌনাচার কেবল ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক ক্ষতিই করে তা নয়, সমাজেও নৈতিকতার অবক্ষয়, অশ্লীলতার প্রচার এবং স্বাভাবিক লিঙ্গ ভিত্তিক অধিকার ও কর্তব্যকে বিকৃত করে দেয়। পাশ্চাত্যের প্রভাবে প্রাচ্যের বিভিন্ন মুসলিম দেশগুলোতেও বর্তমানে এই সংস্কৃতি মহামারীর মত ছড়াচ্ছে। নারী পুরুষ জন্মগত ভাবে আলাদা লিঙ্গের, আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কিন্তু LGBTQ অধিকারের দাবীদারদের মতে, নারী চাইলে পুরুষ হতে পারে আবার পুরুষ চাইলে নারীও হতে পারে, এমনকি নারী-নারী, পুরুষ-পুরুষ শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন-বিয়ে সংসারও করতে পারে। এরকম অসুস্থ প্রকৃতি বিরুদ্ধ চিন্তাভাবনা তারা নিজেরা যেমন চর্চা করছে তেমন মানুষকেও উদ্বুদ্ধ করছে স্বাভাবিকভাবে নেয়ার।

অথচ গবেষকদের মতে, সাধারণ জনসংখ্যার মধ্যে নারী ও পুরুষ সমকামী, উভকামী, রূপান্তরকামী ও কুইয়ার তরুণদের আত্মহত্যার হার এবং আত্মহত্যার চিন্তা তুলনামূলকভাবে বেশি।এলজিবিটি তরুণতরুণী ও অল্পবয়সীদের মধ্যে আত্মহত্যার চেষ্টার হার সবচেয়ে বেশি।

বৈষম্যমূলক আইনের ধারা এলজিবিটি মানুষদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং তাঁদের ভাল থাকার ব্যাপারে প্রচণ্ড নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

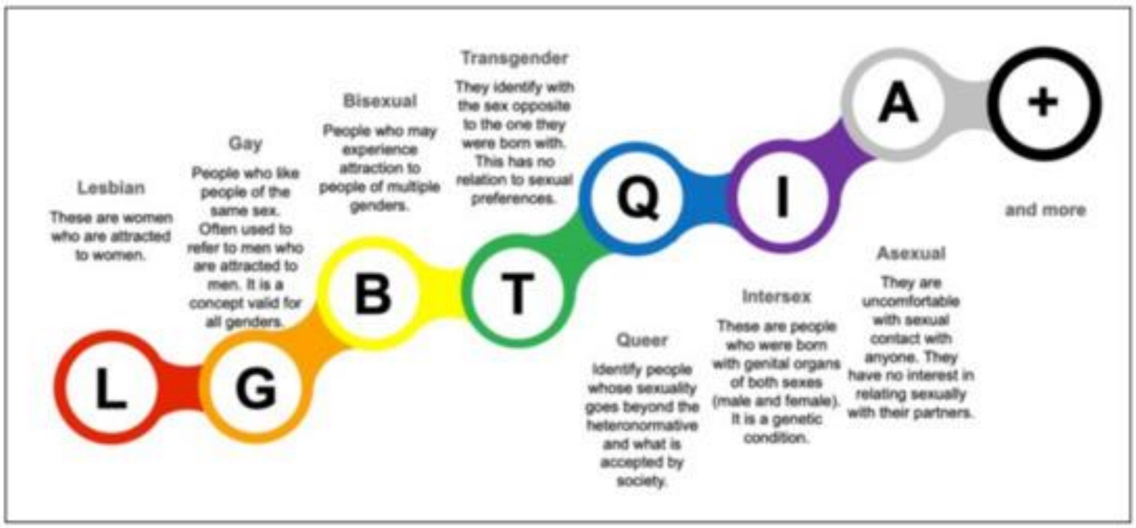

এলজিবিটির পক্ষে দেয়া তাদের যুক্তির মধ্যে রয়েছে যৌনতা ও ব্যক্তি পরিচয় আপেক্ষিক। একজন মানুষ মনে মনে যা চায়, যেমন হতে চায় এটাই মুখ্য।

রূপান্তরকামীতা বা ট্রান্সজেন্ডার মুভমেন্ট এর পক্ষে দেয়া যুক্তি গুলো দিয়ে খুব সহজে সমকামিতার পক্ষে দেয়া যুক্তিগুলো খণ্ডন করা যায়। সমকামিতার পক্ষে বহুল ব্যবহৃত একটি যুক্তি হল মানুষ জন্মগতভাবেই সমকামী হয়। আবার অনেকে বলার চেষ্টা করে একটি বিশেষ জিন (the gay gene) এর কারণে। কিছু মানুষ সমকামী হয়ে জন্মায়। অর্থাৎ তারা দাবি করে সমকামীদের যৌনতা নির্ধারিত বায়োলজি দ্বারা। আবার ট্রান্সজেন্ডার উন্মাদনার পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে বলা হচ্ছে যৌনতা, লৈঙ্গিক পরিচয়

এসব পরিবর্তনশীল, কোন কিছুই পাথরে লেখা থাকে না। নারী হয়ে জন্মানো মানুষ এক সময় পুরুষ হতে পারে, যে নারীদের প্রতি আকর্ষণ বোধ করত একসময়, সে আকর্ষণ বোধ করতে পারি পুরুষের প্রতি এগুলো খুবই স্বাভাবিক। যদি আসলেই তাই হয়, তাহলে নিশ্চয় সমকামিতা জন্মগত হতে পারে না। জন্মগত লিঙ্গ আর যৌনতাকে যদি অস্বীকার করা হয় তাহলে আর জন্মগত সমকামিতা বলে কি থাকে? ঠিক একই ভাবে সমকামী জিন বলেও কোন কিছু থাকতে পারে না। কারণ ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলনের পক্ষে দেয়া যুক্তি অনুযায়ী সমকামিতা, উভকামীতা, পশু কামিতা কিংবা নারী পুরুষের স্বাভাবিক যৌনতা কোন কিছুই জিনগত বা বায়োলজিক্যালি নির্ধারিত না, এগুলো সবই বদলাতে পারে। যার অর্থ একজন সমকামী একসময় বের হয়ে আসতে পারে সমকামিতা থেকে। আর এটা যদি সাধারণভাবে ঘটতে পারে তাহলে নিশ্চয়ই চিকিৎসার মাধ্যমেও কাউকে সমকামিতা থেকে বের করে আনা সম্ভব। অর্থাৎ ট্রান্সজেন্ডার উন্মাদনার পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে সমকামিতার পক্ষে চালানো নিজেদের প্রোপাগান্ডা কে খন্ডন করে বসে আছে সেকুলারিজম সংস্কৃতির ধারক বাহকরা।

পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের করাল গ্রাস

পশ্চিমা দেশগুলিতে পুঁজিবাদ একটি প্রভাবশালী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। তবে, অনেক দেশই মিশ্র অর্থনীতি রয়েছে যা পুঁজিবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক উভয় নীতির অধীনে কাজ করে। বিশ্বের প্রধান পুঁজিবাদী অর্থনীতির দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে হংকং, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সিঙ্গাপুর, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, আয়ারল্যান্ড ইত্যাদি।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এই ভয়ানক চিত্র সর্বপ্রথম বৃটেনে আত্মপ্রকাশ করে। এরপর তা ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে 'মূলনীতি' হিসাবে ছড়িয়ে পড়ে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়

জনসাধারণের কল্যাণ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রশ্নই ছিল না। এজন্য মিল-কারখানায় যেসব পণ্য উৎপাদিত হ'ত সেগুলো ন্যূনতম মজুরিতে সর্বাধিক উৎপাদন এবং ব্যক্তিস্বার্থের নীতিতে উৎপাদন করা হ'ত। ফলে উৎপাদিত পণ্য দ্বারা গুদামগুলো ভরে গেল। অপরদিকে রফতানীর পথ সীমিত হওয়ায় এসব পণ্য গুদামে নষ্ট হ'তে লাগল। কিন্তু পণ্যের এরূপ প্রাচুর্য হওয়া সত্ত্বেও শ্রমিক ও গরীবরা এসব দ্বারা কোন প্রকার উপকৃত হ'ল না। পণ্য উৎপাদনের প্রাথমিক যুগে যেমন তারা নিজেদের প্রয়োজনে এসব পণ্য কিনতে পারত না, তেমনি প্রাচুর্যের সময়েও তারা এসব কেনার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত রইল।

পুঁজিবাদ যেহেতু মানব রচিত মতবাদ সেহেতু এর ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকবে এটাই স্বাভাবিক।

নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে পুঁজিবাদের ত্রুটিগুলো তুলে ধরা হল:

১. অপচয়মূলক প্রতিযোগিতা

২. অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও বেকারত্ব

৩. সম্পদের ত্রুটিপূর্ণ বণ্টন

৪. একচেটিয়া ব্যবসায়ীর উদ্ভব ও তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা সংহতকরণ

৫. বাণিজ্য চক্রের পর্যায়ক্রমিক উপস্থিতি

৬. চরম নৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ের ক্রম বিস্তৃতি

পুঁজিবাদের বর্তমান চিত্র:

১. একক পরাশক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ

২. চরম অর্থনৈতিক বৈষম্য বিরাজমান (ধনী-দরিদ্রের জীবন যাপনের ব্যয়সূচক বিগত দুই দশকে ১০:১ হ'তে ৭০:১ এ উন্নীত)

৩. বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের ছলে বিশ্বকে শোষণের কৌশল গ্রহণ

৪. যুগপৎ চরম দারিদ্র্য ও ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবন যাপন নিত্যকার দৃশ্য

৫. গণতন্ত্রের ধোঁকা দিয়ে মুষ্টিমেয় বিত্তশালী লোকের শাসন প্রতিষ্ঠা

৬. স্যাটেলাইট ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী তথ্যপ্রবাহ ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে পুঁজিবাদী জীবনাদর্শের স্লোপয়জনিং

৭. এনজিও কালচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে শোষণের বিস্তৃতি

৮. আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের মোড়ল এবং

৯. ইসলামের মুকাবিলায় সমাজতন্ত্রের সাথে অভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ।

পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ যে অর্থব্যবস্থা মানব সমাজে আত্মপ্রকাশ করেছে, তা কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্র। পুঁজিবাদী সমাজের মযলূম শোষিত মানুষকে বুঝ দেওয়া হয়েছে যে, ব্যক্তিগত মালিকানাই সকল প্রকার বিপর্যয়ের মূল কারণ। এর উচ্ছেদেই সকল অশান্তি ও শোষণ-নির্যাতনের চির অবসান ঘটবে। এজন্য কমিউনিজমের অর্থনীতিতে প্রথম পদক্ষেপেই ব্যক্তিগত মালিকানা অধিকার অস্বীকার করা হয়েছে এবং অর্থ উৎপাদনের সমস্ত উপায়-উপাদান ও যন্ত্রপাতি (Means and Instruments of production) জাতীয় মালিকানা বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ফলে কমিউনিস্ট সমাজে জাতীয় অর্থোৎপাদনের উপায়-উপাদানের উপর রাষ্ট্র পরিচালক মুষ্টিমেয় শাসক গোষ্ঠীর নিরংকুশ কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়েছে। তারা কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিশেষ

প্লান-প্রোগ্রাম ও পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল উপায়-উপাদান ব্যবহার করে থাকে। তাদের নির্ধারিত নীতি অবনত মস্তকে মেনে নিতে একান্তভাবে বাধ্য হয় সে সমাজের কোটি কোটি মানুষ।

সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যাবলী:

১. দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ

২. ধর্মের উৎখাত

৩. ব্যক্তি স্বাধীনতার উচ্ছেদ

৪. নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি

৫. রাষ্ট্রীয় নিরংকুশ মালিকানা

৬. চিন্তার পরাধীনতা

৭. সর্বহারার নামে একদলীয় শাসন

৮. তাত্ত্বিকভাবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী হ'লেও বাস্তবে সাম্রাজ্যবাদী।

সমাজতন্ত্রের ত্রুটি সমূহ:

১. সম্পদের ভুল মালিকানা ও অসম বণ্টন

২. প্রকৃত চাহিদা নির্ধারণ ও সঠিক মূল্য নিরূপণে ব্যর্থ

৩. ব্যক্তিস্বার্থ পূরণের সুযোগ না থাকায় প্রেষণা অকার্যকর

৪. ভোক্তার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হরণ

৫. কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সত্ত্বেও কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যর্থ এবং

৬. নৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে ব্যর্থ

সমাজতন্ত্রের বর্তমান অবস্থান:

১. সমাজতন্ত্রের বর্তমান গতি ক্রমাগত সংশোধনবাদের দিকে

২. পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলো ক্রমাগত গ্রহণ (সূদ, ব্যক্তি মালিকানা, বাজার ব্যবস্থা, মুনাফা ইত্যাদি

৩. শিল্প উৎপাদনে পুঁজিবাদী বিনিয়োগ ও ব্যবস্থাপনা কৌশল গ্রহণ

৪. পার্টি এলিট ও জনসাধারণের মধ্যে শোষণমূলক সম্পর্ক

৫. পীড়নমূলক, ধোঁকাপূর্ণ, গোজামিলের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পর্যবসিত

৬. রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি

৭. অর্থনৈতিক ও সামাজিক শ্রেণীবৈষম্য বিলুপ্ত করতে ব্যর্থ

৮. পুঁজিবাদের সাথে সহঅবস্থানের নীতি গ্রহণ

৯. ইসলামের মুকাবিলায় পুঁজিবাদের সাথে অভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ

ইসলামী সংস্কৃতির উৎপত্তি ও বিকাশ

জীবন চর্চাই সংস্কৃতি। আর জীবন যেহেতু গতিশীল তাই সংস্কৃতিও সবসময় গতিশীল। জীবনের শুরু যেখান থেকে সংস্কৃতির সূচনা বিন্দুও সেখানেই। পৃথিবীতে মানুষের প্রথম জীবন চর্চা যেহেতু মহান আল্লাহর হিদায়াত ও আনুগত্য দিয়েই শুরু। তাই এ প্রথম জীবন চর্চাই ছিল ইসলামী সংস্কৃতির সূতিকাগার। সুতরাং নিশ্চিতভাবেই এ কথা বলা যায় যে, আদম আলাইহিস সালাম এর দ্বারাই ইসলামী সংস্কৃতির গোড়াপত্তন হয়। এবং যুগে যুগে নবী রাসূলগণের মাধ্যমে তা বিকশিত হয়ে শেষ নবী মুহাম্মদ স. এর যুগে এসে পূর্ণতায় পৌঁছায়।

নবী করীম স. বলেছেন: উন্নত সংস্কৃতির জীবনধারাকে পূর্ণতাদান করার জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি। (ইবন মাজাহ)

কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে:

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا

“আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম। এবং আমি ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।“

(সূরা আল মায়েদাহঃ ৩)

মানুষের বিগত হাজার হাজার বছরের ইতিহাস তার সংস্কৃতিরই ইতিহাস। কারণ প্রথম থেকেই সে সভ্য ছিল। কাজেই সে ছিল একটি সুন্দর রুচিশীল সাংস্কৃতিক জীবনের অধিকারী। একটি অভিন্ন সাংস্কৃতিক জীবন ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে এর যাত্রা শুরু। আল্লাহ তাকে এ জ্ঞান দিয়েছেন। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে: এবং

আল্লাহ আদম আলাইহিস সালাম কে সকল বস্তুর নাম শিখিয়েছেন। এর অর্থ হচ্ছে সকল বস্তুর তাৎপর্য, ব্যবহার বিধি এবং অনুসঙ্গ তিনি আল্লাহর কাছ থেকে শিখেছেন। যাকে পরিপূর্ন জ্ঞান বলে তা এ ভাবে তিনি আহরণ করেছিলেন। পার্থিব কারো নির্দেশ তিনি কোন মূহুর্তেই পাননি। মহান আল্লাহর নির্দেশে চালিত হয়ে সত্যের প্রবর্তনায় তিনি পার্থিব জীবন যাপন করেছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহুওয়াতাআলা আদম আলাইহিস সালাম কে জ্ঞান দান করে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে এর পরিচালনা উন্নয়ন ও বিকাশের ক্ষমতা রেখে দিয়েছেন। যুগে যুগে দেশে দেশে তিন এর প্রয়োগ করেছেন। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে এর ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধান করলে সবার মর্মমূলে একটি অভিন্ন মৌল সাংস্কৃতিক কাঠামো লক্ষ্য করা যাবে।

মানুষের সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে একটি উল্টো ধারা। শয়তানের প্ররোচনা, বিদ্রোহ ও অবিশ্বাসই এ ধারার উৎস। সাংস্কৃতিক বিভ্রান্তি, সাংস্কৃতিক বিকার ও অপসংস্কৃতি এ সবই এ উৎস থেকে উৎসারিত। ইসলামী সংস্কৃতির পাশাপাশি এ শয়তানের অপসংস্কৃতির চর্চাও আবহমান কালের। আদম ও হাওয়া আলাইহিস সালাম অন্যায় করে চলে এলেন এ মাটির পৃথিবীতে। স্বাভাবিকভাবে তাদের সাথে এসে গেলে শয়তান। দ্বন্দ শুরু হলো সত্য ও মিথ্যার, হক ও বাতিলের, ন্যায় ও অন্যায়ের। এখানে একদিকে হিদায়াত অন্যদিকে গোমরাহী। প্রতিযোগিতা সমানতালে। যেখানে ফেরাউন সেখানে মূসা। যেখানে নমরুদ সেখানে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। নমরুদ ভীষণ শক্তিধর। কিন্তু ইবরাহীম অসীম সাহসী। সংস্কৃতির সূচনা বিন্দুতে কোন বুদ্ধিভ্রষ্টতা-কোন জড়তা নেই, আছে প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত সত্যনিষ্ঠা। মানুষ কোন দিন অসভ্য, অমানুষ বা অপমানুষ ছিল না। সে প্রথমেও মানুষ, মাঝেও মানুষ, শেষেও মানুষ। স্থান ও কাল তার বুদ্ধির সাথে যুক্ত হয়ে বিচিত্র ও নিত্য নতুন রূপ নিয়েছে। জ্ঞানই মানুষকে বৈশিষ্ট মন্ডিত করেছে। জ্ঞান থেকেই তার যাত্রা শুরু। তার জ্ঞানই শয়তানকে তার

চির শত্রুর সারিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। শয়তানের আছে বুদ্ধির অহংকার, মানুষের আছে বুদ্ধি ও জ্ঞানের সম্পদ। জ্ঞানের অভাবেই শয়তান পথভ্রষ্ট। বুদ্ধির অহংকার ও ঔদ্ধত্যের কারণেই শয়তান চিরকালের জন্য অভিশপ্ত হলো। আসলে জ্ঞান ছাড়া, বুদ্ধি একটা পাগলা হাতি বৈ আর কিছু নয়। তাইতো শয়তানের কোন সৃষ্টি নেই, শুধু ধ্বংস, ধ্বংসু আর ধ্বংস। মানুষের সৃষ্টিতে ভাঙার কাজে তার ভূমিকা সক্রিয়। আর আদম আলাইহিস সালাম বিদ্রোহে শামিল হয়েও নতুন প্রথিবীর সম্রাট। কারণ তাঁর মধ্যে লজ্জাবোধ ছিলো, ছিল অনুশোচনা। আমরা জানি আদম আলাইহিস সালাম সব সময় শরমিন্দা ছিলেন যে, তিনি আল্লাহর আদেশকে অমান্য করে জান্নাত থেকে বিতাড়িত হয়েছিলো। আল্লাহর প্রতিনিধি ও প্রেরিত পুরুষ হিসেবে আদম আলাইহিস সালাম এর প্রধান দায়িত্ব ছিল এ দুনিয়ায় আল্লাহর খিলাফত (রাজত্ব) কায়েম করা এবং পৃথিবীকে মানুষের বাসোপযোগী করে গড়ে তোলা। এ ভাবে আদম আলাইহিস সালাম এর মাধ্যমে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম দ্বীন ইসলাম তথা ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তিমূল রচিত হলো।

আদম আলাইহিস সালাম এর পর যে পয়গম্বরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তিনি হচ্ছেন নূহ আলাইহিস সালাম। তিনি আল্লাহর দ্বীন তথা ইসলামী সংস্কৃতিকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। মানুষের অবিশ্বাস, অবিবেবচনা এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পুথিবীকে অপরিচ্ছন্ন করেছিল। তখন প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল দ্বীনকে পরিশুদ্ধ ও যুযেগাপযোগী করবার। আল্লাহ তাআলা নূহ আলাইহিস সালাম কে প্রেরণ করেছিলেন তাঁর স¤প্রদায়ের অপরিচ্ছন্ন লোকদেরকে পরিচ্ছন্ন ও সংস্কৃতিবান করার জন্য। কুরআনের ভাষায় নূহ আলাইহিস সালাম তাঁর স¤প্রদায়ের লোকদেরকে বলেছিলেন: তোমরা যদি ন্যায়পথে চল এবং বিশুদ্ধতা অর্জন তথা

সংস্কৃতিবান হওয়ার চেষ্টা করো তা হলে আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে তারা তাঁর কথায় কর্ণপাত করলো না।

নূহ আলাইহিস সালাম এর সময় ইসলামের যে রূপটি প্রস্ফুটিত হয়েছিল সেটি ইসলামী সংস্কৃতির পূর্ণরূপ নয়। আদম আলাইহিস সালাম থেকে অনেকটা অগ্রসর, কিন্তু পূর্ণারূপে প্রতিষ্ঠিত নয়। মানুষ তখনো পার্থিব ঐশ্বর্যকে একমাত্র কাম্য মনে করতো এবং তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের অনুশোচনা ছিলনা। সুতরাং পয়গম্বর তাদের ধ্বংস কামনা করলেন। এখানেই নূহ আলাইহিস সালাম এর অসম্পূর্ণতা। তিনি অধৈর্য হয়েছিলেন এবং পাপীদের ধ্বংস চেয়েছিলেন।

নূহ আলাইহিস সালাম এর পরে উল্লেখযোগ্য নবী হলেন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। তিনি ছিলেন সত্যানুসন্ধ্যানী এবং সত্য সাধক। সুস্পষ্টভাবে দ্বীনের কার্যক্রমের গণনা আমরা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম থেকেই করে থাকি। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর পিতা আজর ছিলেন মূর্তিপূজক এবং তার ব্যবসা ছিল মূর্তি নির্মাণ। আজর নিয়মিত মূর্তি নির্মাণ করতেন এবং দক্ষ মূর্তি নির্মাতা হিসেবে তার খ্যাতি ছিল। সংস্কৃতিবান ব্যক্তি হিসেবে শৈশব থেকেই ইবরাহীম আলাইহিস সালাম মূর্তিপূজার প্রতি বিরূপ ছিলেন। তিনি কোন দিন মূর্তিপূজা করেননি। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বহুবিধ জিজ্ঞাসা ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সত্যকে আবিস্কার করেছিলেন এবং বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কুরআন মজীদে বিশদভাবে এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর পরে যে নবীর নাম ইতিহাসের ক্রমধারায় উল্লেখযোগ্যতা পেয়েছে, তিনি হচ্ছেন মূসা আলাইহিস সালাম। মূসা আলাইহিস সালাম কে ইহুদীরা তাদের আইন প্রণেতা হিসেবে মনে করে। যথার্থই তিনি পার্থিব জীবন ব্যবস্থাপনায় এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অনুশাসন

প্রবর্তন করেছিলেন, যেগুলো এখনো প্রাচীনপন্থী ইহুদীরা মেনে চলে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন ধীরে ধীরে ইসলামী আইন ও সংস্কৃতি গড়ে উঠছিল তখন অনেক অনুশাসনের ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসুল মূসা আলাইহিস সালাম এর আইনকে অবলম্বন করেছিলেন। বনী কুরায়যা যখন বিশ্বাসঘাতকা করেছিল তখন তার শাস্তি দেয়া হয়েছিল ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাত এর আইনানুসারে। ইসলামে খাদ্যাভাসে হারাম-হালালের যে নির্দেশাবলী আছে, সেগুলো মূসা আলাইহিস সালাম এর অনুশাসনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। মূসা আলাইহিস সালাম নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, কোন দেবমূর্তির উদ্দেশ্যে নিহত প্রাণী হারাম, চৌর্যবৃত্তির মাধ্যমে গৃহীত প্রাণীও হারাম। চতুষ্পদ জন্তুগুলোর মধ্যে যে প্রাণী তৃণভোজী এবং যাদের পায়ে ক্ষুর আছে এবং যে ক্ষুর দ্বিধা বিভক্ত সেই প্রাণী হালাল। কিন্তু আল্লাহর নামে জবাই না করলে তা হারাম হবে। রক্ত হারাম এবং শুকর হারাম। আমরা এ অনুশাসন ও সংস্কৃতির সবকটি গ্রহণ করেছি। তবে আমাদের মধ্যে নতুন কিছু অনুশাসন ও সংস্কৃতি এসেছে এবং খাদ্য বিষয়ে অতিরিক্ত কিছু বিচার বিবেচনাও এসেছে।

ইসলামী সংস্কৃতির পূর্ণতা এলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে। ইসলাম যেমন সকল দ্বীনের সর্বশেষ সংস্করণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন তেমনি সর্বশেষ ঐশী বাণীবাহক। তাই দেখা যায়, ইসলামই একমাত্র দ্বীন যেখানে সকল দ্বীনের সুন্দরতম গুণগুলোর পূর্ণতা বিকাশ সম্ভবপর হয়েছে। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চরিত্র বৈশিষ্ট্যেও সকল নবী-রাসূল ও মহাপুরষের শ্রেষ্ঠ গুণগুলোর অভূতপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে। তাঁর মধ্যে আদম আলাইহিস সালাম এর মহত্ত্ব, নূহ আলাইহিস সালাম এর প্রচারনিষ্ঠা, সালেহ আলাইহিস সালাম এর বিনীত প্রার্থনা, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর একত্ববাদ, ইসমাঈল আলাইহিস সালাম এর আত্মত্যাগ , মূসা আলাইহিস সালাম এর পৌরুষ, হারুন আলাইহিস সালাম

এর কোমলতা, ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর সৌন্দর্য, ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এর ধৈর্য, আইউব আলাইহিস সালাম এর সহনশীলতা, দাউদ আলাইহিস সালাম এর সাহসিকতা, সুলায়মান আলাইহিস সালাম এর বিচারজ্ঞান ও ঐশ্বর্য, ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম এর সরলতা, ইউনুস আলাইহিস সালাম এর অনুশোচনা, ঈসা আলাইহিস সালাম এর অমায়িকতা ইত্যাদি সকল সুমহান গুণের পূর্ণ সমন্বয় ঘটেছিল। তাঁর প্রচারিত দ্বীনে যেমন সকল দ্বীনের সার-সংস্কৃত হয়ে বিকাশ লাভ করেছে, তেমনি তাঁর জীবন বিকাশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে সকল প্রেরিত পুরুষের চারিত্রিক-বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে। তাই বলা হয়, তাঁর প্রচারিত আদর্শই মানব জাতির জন্য পূর্ণ আদর্শ।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ [الاحزاب: ٢١]

“নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ।”

(সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ২১)

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواۚ﴾ [الحشر:٧]

“রাসূল তোমাদেরকে যা দেয়, তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে, তা থেকে বিরত থাক।”

(সূরা আল-হাশর, আয়াত: ৭)

বস্তুত তিনি মানবমন্ডলীকে নিছক পরলৌকিক মুক্তির পথ দেখাননি। তিনি সকল মানুষেরই ইহজগত থেকে পরজগত পর্যন্ত অখন্ড সুন্দর জীবনের সন্ধান ও পূর্ণস্বাদ পাওয়ার পথ দেখিয়েছে।

একজন সংস্কৃতিবান মানুষের যেসব গুণ থাকা প্রয়োজন শৈশব থেকেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মধ্যে তা বিদ্যমান ছিল। আরবে সে যুগে এটা ছিল একটি দুর্লভ মহিমা। এই মহিমায় বিভূষিত যে পরিচ্ছন্ন পুরুষ তাঁকেই আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা নির্বাচিত করেছিলেন তাঁর, প্রতিনিধিরূপে। শৈশব থেকেই মহানবী স. সত্যবাদী এবং ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন। তাই সকলে তাঁকে বলতো আল-আমীন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মধ্যে সত্যের প্রেরণা এসেছিল। কোনরূপ অপসংস্কৃতি তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। আরবের লোকেরা দীর্ঘ রাত জেগে গল্পের আসর বসাতো। এসব গল্পের আসরে পান-ভোজন চলতো। বালক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একবার ইচ্ছা হয়েছিল এরকম একটি গল্পের আসরে যোগ দেয়ার। কিন্তু তাঁর যোগ দেয়া হয়নি। যে গৃহে গল্পের আসর বসেছিল সে গৃহ পর্যন্ত আসতে আসতে তাঁর নিদ্রা আসে। এবং নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে তিনি পথিমধ্যে শুয়ে পড়েন।

আর একটি ঘটনার কথা আমরা বলতে পারি। যখন কাবাঘর সংস্কারের সময় বালক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিযুক্ত হয়েছিলেন। সে সময়কার প্রথামত নির্মাণ কাজে যারা নিযুক্ত হতো তারা উলঙ্গ হয়ে নির্মাণের উপকরণ বহন করে আনতো। যখন বালক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেও উলঙ্গ হতে বলা হলো। তখন তিনি চৈতন্য হারিয়ে ফেললেন। এর ফলে তাঁকে আর উলঙ্গ হতে হয়নি। দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিটি অবস্থায় আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে পবিত্র রেখেছিলেন। কোন

প্রকার অন্যায় কর্ম তাঁর দ্বারা সংঘটিত হয়নি। এবং আরবের অপসংস্কৃতি তাকে গ্রাস করতে পারেনি। যেহেতু তিনি আল্লাহ কর্তৃক নিয়োজিত ছিলেন কল্যাণের আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য, সে জন্য আল্লাহ কখনো অকল্যাণ ও অপবিত্রতার স্পর্শ তাঁর দেহে এবং মনে লাগতে দেননি।

শৈশব থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের পরিপন্থী কোন প্রথা অনুসরণ করেননি। আল্লাহ তাআলা সব সময় তাঁকে পরিচ্ছন্ন রেখেছিলেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, নবুওয়াত প্রাপ্তির ফলেই নানাবিধ বিষয়ে তাঁর ধ্যান-ধারনার পরিবর্তন সাধিত হয়নি। নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেই তাঁর মধ্যে মূর্তিপূজার বিরোধিতা ছিল। তাছাড়া তিনি কুরাইশ বংশের বিভিন্ন দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত খাদ্য কখনো গ্রহণ করেননি। আরবের লোকেরা মরুভূমির বালুর মধ্যে বিচরণকারী এক ধরনের চতুষ্পদ জন্তু আহার করতো। এই জন্তু গুলো দাঁতালো এবং ইঁদুরের সমগোত্রীয় ছিল। নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে বাল্যে ও যৌবনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো এ ধরনের ইঁদুরের গোশত ভক্ষণ করেননি।

সৈয়দ আলী আহসান তাঁর 'সংস্কৃতির উজ্জীবনের ক্ষেত্রে মহানবী' শীর্ষক প্রবন্ধে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। মক্কা বিজয়ের পর বিভিন্ন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতে হাত রেখে শপথ গ্রহণ করেন। মহিলারাও শপথ গ্রহণ করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাদের হাত স্পর্শ করেননি। তার সামনে পানি ভরা একটি পাত্র ছিল। তিনি সেই পানিতে নিজের ডান হাত ডুবিয়ে তুলে নেন এবং মহিলারা একে একে সেই পানিতে হাত রেখে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে বাইআত বা দীক্ষা গ্রহণ করেন। পানিতে হাত রাখবার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এ পানিতে যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম হাত রেখেছিলেন, সুতরাং যারাই এ পানিতে হাত রেখেছেন তারাই আল্লাহর রাসুলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতের স্পর্শ পেয়েছেন এটাই ধরে নিতে হবে। এভাবে পানি ব্যবহারের ফলে সমগ্র ঘটনাটি একটি কাব্য মর্যাদা পায়। পৃথিবীর কোন ধর্মের ইতিহাসে এহেন মধুর দীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি কখনো ঘটেনি। তিনি যে সংস্কৃতিবান পুরুষ ছিলেন এবং তাঁর যে কাব্যিক অনুভূতি ছিল এতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

একটি বর্ণনায় আছে যে, মদীনা শরীফে একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পথ হেঁটে যাচ্ছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, সামনে রাস্তার পাশে একটি খেজুর গাছের আড়ালে আবেদনপত্র নিয়ে একটি হাত বেরিয়ে এসেছে। তিনি থমকে দাঁড়ালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন 'এ হাতটি কার- পুরুষের না মহিলার?' খেজুর গাছের আড়াল থেকে উত্তর এলো, 'মহিলার'। রাসূলুল্লাহ স. তখন মন্তব্য মন্তব্য করলেন, 'মহিলার হাত-তা হলে মেহিদী নেই কেন? এ কাহিনীতে বোঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেমন সৌন্দর্যপ্রিয় ছিলেন। এ ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল বিষয়ে সঙ্গতি খুঁজতেন। আরবের প্রতিটি মানুষকে তিনি একই সঙ্গে বিশ্বাসে এবং সৌন্দর্য চেতনার উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন।

সংস্কৃতির নান্দনীক প্রকাশ ঘটে মানুষের আচরণে। প্রাত্যহিক কর্মব্যবস্থাপনায়, পোশাক পরিচ্ছদে, পর্যটনে এবং পরিচ্ছন্ন ইচ্ছার বিকাশে। এসব কিছু সাধারণভাবে একজন মানুষের চরিত্রে ধরা পড়া কঠিন। কোন না কোন ক্ষেত্রে কোন বিষয়ে মানুষের খর্বতা থাকতে পারে এবং তা থাকা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একজন পূর্ণাঙ্গ পুরুষ ছিলেন যে, কোন ক্ষেত্রেই তাঁর খর্বতা ছিলনা।

তিনি পরিচ্ছন্ন পুরুষ ছিলেন এবং তাঁর পরিচ্ছন্নতা সকল কর্মে প্রকাশ পেত। তাঁর কর্মে কোন ভারসাম্যহীনতা ছিলনা। তিনি তাঁর প্রতিটি কর্ম সুনির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করতেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন পূর্ণাঙ্গবোধের মানুষ ছিলেন। আর এই পূর্ণাঙ্গবোধই হচ্ছে সংস্কৃতির পৃষ্ঠভূমি। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একজন মানুষের চিন্তাধারা, জীবন যাপন প্রণালী এবং আকীদাহ-বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চিন্তাধারা ছিল স্বচ্ছ এবং সংশয়মুক্ত। শৈশব থেকেই তাঁর মধ্যে শুদ্ধতা এবং পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে সংশয়মুক্ততা প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁর দৈনন্দিন জীবন ধারার মধ্যে পরিমিতিবোধ, বিবেচনাবোধ এবং বিচার-বুদ্ধি সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছিল। মলিন পোশাক তিনি পরিধান করতেন না, খাদ্যাভ্যাসে তিনি ছিলেন স্বল্পাহারী। অতিথি আপ্যায়নে তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান। এক কথায় তিনি ছিলেন সকল কিছু নিয়ে সমাবত অথচ সকল কিছুর উর্দ্ধে। কবি-সাহিত্যিকরা যুগ যুগ ধরে বিচিত্র শব্দ সম্ভারে তাঁর গুণাবলী ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন, কিন্তু কখনো পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেননি। তিনি ছিলেন মানুষের পরম হিতৈষী বন্ধু এবং আল্লাহর গুণে গুণান্বিত ইনসান-ই-কামিল। তিনি যখন পৃথিবীতে এলেন সে সময় পৃথিবী অপসংস্কৃতি ও পাপ-পঙ্কিলতায় পরিপূর্ণ ছিল। তিনি এসে পৃথিবীকে সংস্কার ও পরিচ্ছন্ন করলেন। ফতেহ মক্কার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নির্দেশে বলেছিলেন: সত্য এসে গেছে, মিথ্যা নির্মূল হয়েছে, নি:সন্দেহে মিথ্যা নির্মূল হবারই বিষয়।২৬ মক্কা বিজয়ের পর সমগ্র আরবের জন্য এবং পরবর্তীতে গোটা বিশ্বের জন্য এমন একটি সাংস্কৃতিক ধারা প্রতিষ্ঠিত হলো যা অদ্যাবধি বিদ্যমান রয়েছে। এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এভাবে আদম আলাইহিস সালাম এর দ্বারা ইসলামী সংস্কৃতির যে ভিত রচিত হয়েছিল

যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে তা বিকশিত হয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে এস পূর্ণতা লাভ করলো।

ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য

ইসলামী সংস্কৃতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো -

১) তাওহীদ

২) মানবতাবোধ

৩) সর্বজনীনতা (Universality)

৪) বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব

৫) শান্তি ও কল্যাণকামী

৬) কুসংস্কারমুক্ত

৭) কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ

৮) বাহ্যিক ও আত্মিক পবিত্রতা

৯) ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা

১০) উদারতা, জ্ঞানালোক ও গতিশীল জীবনচেতনা

এসব মৌল উপাদান ও ভাবধারাকে কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, তা-ই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি। সংস্কৃতিতে এর কোন একটি উপাদান ও ভাবধারার অভাব থাকবে তা আর যাই হোক ইসলামিক সংস্কৃতি হবে না এবং তা হতে পারে না ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসীদের গ্রহণযোগ্য সংস্কৃতি। মুসলিম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এ সংস্কৃতি প্রাসঙ্গিক, আবেদনপূর্ণ, যার গুরুত্ব অনেক প্রবল, গভীর, বিরাট।

তাওহীদ তথা একত্ববাদে বিশ্বাস

ইসলামী সংস্কৃতির মূল কথা হল, একথা স্বীকার করা যে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা গোটা বিশ্ব লোকের এক ও একক স্রষ্টা, তিনি একমাত্র সার্বভৌম প্রভু। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ায় আল্লাহর প্রতিনিধি এবং কুরআন মাজীদ আল্লাহর কালাম, হেদায়েতের সর্বশেষ বিধান। ইসলামী মতাদর্শে তাওহীদ বিশ্বাস হলো সর্বপ্রথম এবং সর্বাধিক মৌলিক বিষয়।

তাওহীদের এ আকিদার দৃষ্টিতে ইসলামিক সংস্কৃতি বংশীয় পার্থক্য, বর্ণগত বৈষম্য - বিরোধ, আর্থিক অবস্থা ভিত্তিক শ্রেণী - পার্থক্য, ভৌগলিক সীমাভিত্তিক শত্রুতা প্রভৃতিকে আদৌ বরদাস্ত করতে পারে না। অথচ এসবের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে দুনিয়ার অন্যান্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি। মানুষে মানুষে যৌক্তিক ও সঠিক সাম্যই হচ্ছে মানুষ সম্পর্কে ইসলামী সংস্কৃতির একমাত্র দৃষ্টি। আল্লাহকে এক ও লা- শরীক সার্বভৌম বলে স্বীকার করা এবং সকল মানুষকে মূলগতভাবে সমান অধিকার সম্পন্ন মেনে নেয়া শুধু - মৌখিকভাবে মেনে নেয়াই নয়, বাস্তব ক্ষেত্রেও সেই অনুযায়ী ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবন পরিচালিত করাই হলো ইসলামিক সংস্কৃতির মর্ম বাণী। ইসলামী সংস্কৃতি দৃষ্টিতে একজন শ্রমজীবী ও তেমনি সম্মানের অধিকারী যেমন সম্মানীয় কোন কারখানার মালিক। সম্মানের ভিত্তি আর্থিক বা বংশ - গোত্র নয় বরং তাওহীদে বিশ্বাস ও তাক্বওয়া তথা আল্লাহভীতি।

আল্লাহ বলেনঃ

الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيْمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُوْنَ

“যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যেই শান্তি এবং তারাই সুপথগামী ।”

(সূরা আন’আম: ৮২)

মানবতাবোধ

ইসলামি সংস্কৃতির আরেক অনুপম বৈশিষ্ট্য হলো মানবতাবোধ। মোমিনের জীবনবোধ মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ। মানবতাবোধ মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ; বরং এটিই মানুষের শ্রেষ্ঠতম মানবিক গুণ। মানবতাবোধ হলো, মানুষের জন্য অনুভূতি, মানবিক চেতনা, মানুষের কল্যাণ কামনা, মানুষের দুঃখ-কষ্টে ব্যথিত হওয়া এবং মানুষের সুখ-শান্তিতে আনন্দিত হওয়া। এ বোধ থেকেই মানুষ মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করে, মানুষ মানুষের উপকারে তৎপর হয়, মানব কল্যাণে ব্রতী হয়। মানুষের উন্নতি ও সর্বাঙ্গীণ সুখ-শান্তি বৃদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগ করে। এ বোধ থেকেই মানুষ মানুষের প্রতি সুবিচার করে, মানুষ মানুষের অধিকার দিয়ে দেয়, অধিকার সংরক্ষণ করে। মানুষের অধিকার লুণ্ঠিত হলে, মানুষের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন হলে অপর মানুষের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এরই নির্দেশে দয়া ও অনুকম্পার অভ্যাসকে সামাজিক বাস্তবতায় পরিণত করে ইসলামি সংস্কৃতি। ন্যায়, ইনসাফ, কল্যাণ, ত্যাগ ও অন্যের দুঃখমোচনের প্রয়াস ইসলামি সংস্কৃতির অবধারিত অংশ।

সাংস্কৃতিক এই বোধ ও বাস্তবতার অভাবেই মানুষ মানুষের অধিকার হরণ করে, মানুষ মানুষের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন চালায়, মানুষ মানুষকে কষ্ট দেয়, মানুষের দুঃখ-কষ্টে মানুষ ব্যথিত হয় না, মানব-কল্যাণে এগিয়ে আসে না, মানব সেবায় ব্রতী হয় না।

এরকম মানুষ মানবীয় চেতনাবোধহীন। মূলত এটিই হলো জড়বাদী খোদাহীন সংস্কৃতির আত্মকেন্দ্রিকতার অভিশাপ।

সর্বজনীনতা (universality)

ইসলামী সংস্কৃতি এক সর্বজনীন সংস্কৃতি। তা বিশেষ কোন গোত্র, বর্ণ, শ্রেণী, বংশ, কাল বা অঞ্চলের উত্তরাধিকার নয়। তার সীমা- পরিধি সমগ্র বিশ্বলোক এবং গোটা মানব বংশের পরিব্যপ্ত ও বিস্তীর্ণ। তাতে বিশেষ ভাষা বা বংশের দৃষ্টিতে কোন সংকীর্ণতার অবকাশ নেই। ইসলামী সংস্কৃতির এ হলো তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর একত্ব ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতে বিশ্বাসী প্রত্যেক ব্যক্তিই এ সংস্কৃতির অধিকারী, সে যে ভাষায় কথা বলুক তার গায়ের বর্ণ যাই -হোক সে প্রাচ্য দেশীয় হোক, কি পাশ্চাত্য দেশীয়। তার আচার-আচরণ ও জীবনযাত্রা ইসলামী ভাবধারায় পরিপুষ্ট, ইসলামী রঙে রঙিন এটুকুই যথেষ্ট। কারণে ইসলামী সংস্কৃতি ব্যাপক ও সর্বাত্মক ভূমিকার অধিকারী।

বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব

ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তি হল দ্বীন (الدين) । রক্তের সম্পর্ক এর তুলনায় একেবারেই গৌণ। তাই এ দুটির কোন একটিকে অগ্রাধিকার দেয়ার প্রশ্ন উঠলে দ্বীনি সম্পর্কের দিকটি প্রাধান্য পাওয়ার অধিকারী হবে। ইতিহাসে এই সংস্কৃতির প্রথম প্রকাশ ঘটেছে হিজরতের পরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রচিত সমাজ সংস্থায় বহিরাগত এবং স্থানীয় লোকেদের পারস্পরিক ভাতৃ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে। এ ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠেছিল রক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে নয় - ভাষার, বর্ণের বা স্বদেশের ভিত্তিতেও নয় বরং তা গঠিত হয়েছিল একমাত্র দ্বীনের ভিত্তিতে। এরা সবাই ছিলেন একই দ্বীনে বিশ্বাসী, একই জীবনাদর্শের অনুসারী, একই ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ও একই লক্ষ্য পথের যাত্রী। হাফসার (আবিসিনিয়া) বেলাল, রোমের সুহাইব, পারস্যের সালমান, মক্কার আবু বকর, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুম ও মদিনার আনসারগণ এ আদর্শভিত্তিক ও সংস্কৃতিবান সমাজে নিঃশেষে একাকার হয়ে গিয়েছিলেন। এভাবে একটি মানব সমাজ তার সাংগঠনিক পর্যায়ে একই সংস্কৃতির অনুসারী একটি মহান মিল্লাতে পরিণত হয়েছিল। এ মিল্লাতটি ছিল যেন একটি পূর্ণাঙ্গ মানব - দেহ। এর যে কোন অঙ্গে ব্যথা অনুভূত হলে পূর্ণ দেহটিই সে ব্যথায় জর্জরিত হয়ে উঠত।

আল্লাহ বলেনঃ

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ- মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায় তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে”

(সূরা হুজুরাতঃ ১০)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ" এক মুসলিম আরেক মুসলমানের ভাই। সে তার ওপরে জুলুম করে না, তাকে সহযোগিতা করা পরিত্যাগ করে না এবং তাকে লাঞ্ছিত ও হেয় করে না। কোন ব্যক্তির জন্য তার কোন মুসলিম ভাইকে হেয় ও ক্ষুদ্র জ্ঞান করার মত অপকর্ম আর নাই।

[মুসনাদে আহমাদ]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, "ঈমানদারদের সাথে একজন ঈমানদারের সম্পর্ক ঠিক তেমন যেমন দেহের সাথে মাথার সম্পর্ক। সে ঈমানদারদের প্রতিটি দুঃখকষ্ট ঠিক তেমনভাবে অনুভব করে, যেমনভাবে মাথা দেহের প্রতিটি অংশের ব্যথা অনুভব করে।"

[মুসনাদে আহমাদ]

অপর একটি হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "পারস্পরিক ভালবাসা, সুসম্পর্ক এবং একে অপরের দয়ামায়া ও স্নেহের ব্যাপারে মুমিনগণ একটি দেহের মত। দেহের যে অংগেই কষ্ট হোক না কেন তাতে গোটা দেহ জ্বর ও অনিদ্রায় ভুগতে থাকে।"

[বুখারী: ৬০১১, মুসলিম: ২৫৮৬]

বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের সবচেয়ে বড় নজির দেখা যায় বায়তুল্লাহর হজ্বের কাফেলায়। ভিন্ন গোত্রের, ভিন্ন বর্ণের, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন দেশ ও এলাকার মানুষেরা একই কাফেলার সাথী হয়ে যায় কেবলই একটা পরিচয়ে "মুসলিম"।

শান্তি ও কল্যাণকামী

ইসলামি সংস্কৃতির অভিবাদন প্রনালীর প্রথম শব্দই “ السلام “ যার অর্থ “শান্তি”। অভিবাদনে বলা হয় “السلام عليكم” শান্তি ও রহমত বর্ষনের দুআর মাধ্যমে একে অপরের প্রতি কল্যাণকামীতা এ সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

সমাজে অকারন রক্তপাত কিংবা বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়া এবং অন্যের সাথে অকারন সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া ইসলামি সংস্কৃতির পরিপন্থী। যা কিছু ভালো - কল্যাণময়, তার সম্প্রসারণ এবং যা কিছু মন্দ ও ক্ষতিকর, তার প্রতিরোধই হল এ সংস্কৃতির মূলনীতি। অন্যায়কে প্রতিরোধ করার জন্য শক্তি প্রয়োগ অপরিহার্য হয়ে উঠলে তাকে এড়িয়ে না যাওয়াও এই সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ দিক।

اللهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

“আল্লাহ অশান্তি বিস্তারকারীদেরকে পছন্দ করেন না।” (সূরা মায়িদাঃ ৬৪)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
‘প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি, যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।’
(বুখারি: ৬৪৮৪; মুসলিম: ৪০)

اَحۡسِنۡ كَمَاۤ اَحۡسَنَ اللّٰهُ اِلَیۡكَ وَلَا تَبۡغِ الۡفَسَادَ فِی الۡاَرۡضِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ الۡمُفۡسِدِیۡنَ

আল্লাহ যেমন তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তেমনি তুমিও (অন্যদের প্রতি) অনুগ্রহ কর। আর পৃথিবীতে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টা করো না। জেনে রেখ, আল্লাহ অশান্তি ও বিপর্যয় বিস্তারকারীদের পছন্দ করেন না।

(সূরা ক্বাসাস:৭৭)

কুসংস্কারমুক্ত

সব ধরনের কুসংস্কার থেকে মুক্ত হওয়া ইসলামি সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কুসংস্কার একটি সামাজিক ব্যাধি, যা সমাজের অধঃপতন ঘটায়; সমাজের মধ্যে অশান্তি ও অমঙ্গল টেনে আনে; এর কারণে সামাজিক অবক্ষয় ঘটে। তাই এ থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। কুসংস্কার অর্থ ভ্রান্ত ধারণা বা বিশ্বাস, সামাজিক প্রথা বা ধর্মের বিষয়ে দলিলহীন ও যুক্তিহীন বিশ্বাস, অশুদ্ধ, অমার্জিত বা দূষণীয় কাজ। এখানে কুসংস্কার বলতে সেসব কৃষ্টি, আচরণ, অভ্যাস, প্রথা, ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসকে বুঝানো হয়েছে, যেগুলোকে সিদ্ধ, সভ্যতা, পুণ্য ও ধর্মের অংশ মনে করা হয়, অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে তা সভ্যতা ও দ্বীনের আওতায় পড়ে না।

বস্তুত সেগুলো ইসলামি রীতিনীতি ও সভ্যতার পরিপন্থি বলেই বিবেচিত। হাদিসে এ জাতীয় বিষয়কেই মুহদাসাতুল উমুর (নব আবিষ্কৃত বিষয়াদি) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এগুলোর ওপর আমল করা গোমরাহি, যা ব্যক্তিকে জাহান্নামে পৌঁছে দেয়। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সমগ্র উম্মতকে সব ধরনের কুসংস্কার ও বিদাতকে পরিত্যাগ করে একমাত্র তাঁর ও সাহাবিদের সুন্নাহ অনুযায়ী জীবনযাপন করার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এতেই রয়েছে চিরকল্যাণ ও শান্তি। মূলত সুষ্ঠু ও শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে কুসংস্কারের মূলোৎপাটন আবশ্যক। সে ক্ষেত্রে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব হলো কুসংস্কার বা বিদাতকে কোনোরূপ প্রশ্রয় না দেয়া।

কর্তব্য ও দায়িত্বানুভূতি

ইসলামী মিল্লাতের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই যেমন অবহিত হতে হয় নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে তেমনি সমষ্টির প্রতি স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কেও তাকে বিস্তারিতভাবে জানতে হয়। একজন অনুগত সন্তান, স্নেহময় পিতা, সহৃদয় ভাই -বোন এবং বিশ্বাসী স্বামী ও স্ত্রী রূপে প্রত্যেকেরই অধিকার এখানে সুনির্ধারিত। কর্তব্যের অনুভূতি তাকে সমগ্র জীবনভর সক্রিয় করে রাখে। অধিকার হরণ বা লংঘন তার কাছে চিরন্তন আজাবের কারণ রূপে বিবেচিত।

আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তব্যপরায়ণতার ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন,

'তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।' (সহিহ বুখারী: ৬৬৫৩)

আল্লাহতায়ালা মানুষকে কর্তব্য পালনের নির্দেশ দিয়েছেন,

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

"তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যানের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে"

(সূরা আলে ইমরান: ১১০)

অনাথ, মিসকিন, দুস্থ ও হতদরিদ্র ব্যক্তিদের সর্বাত্মক সাহায্য-সহায়তা করা অপরিহার্য। আল্লাহতায়ালা ঘোষণা করেছেন,

وَفِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ

'আর তাদের (ধনীদের) সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।'

(সূরা আয যারিয়াত: ১৯)

বাহ্যিক ও আত্মিক পবিত্রতা

ইসলামি সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো বাহ্যিক ও আত্মিক পবিত্রতা। আল্লাহতায়ালা নিজে পবিত্র এবং তিনি পবিত্রতা পছন্দ করেন। পবিত্রতা বলতে বাহ্যিক বা দৈহিক এবং অন্তরের বা মনের উভয় প্রকার পবিত্রতা বোঝায়। ইসলাম উভয় ধরনের পবিত্রতার ওপর গুরুত্বারোপ করে থাকে। ইবাদতের জন্য যেমন পবিত্রতা দরকার, তেমনি থাকাওখাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, জীবিকা অর্জন, চিন্তা-চেতনা ইত্যাদি সব

ক্ষেত্রে পবিত্রতা বা বিশুদ্ধতার ওপর ইসলাম গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। ইসলামি সংস্কৃতি মানুষের মধ্যে যে বিশেষ ধরনের মন ও মননশীলতা সৃষ্টি করে, তা সব ধরনের কলুষতা, আবিলতা, পংকিলতা, সংকীর্ণতা, হঠকারিতা, কপটতা, ধোঁকা, প্রতারণা, বকধার্মিকতা, অশ্লীলতা, উলঙ্গতা, নির্লজ্জতা, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, পাষ-তা, অমানবিকতা, জুলুম, নির্যাতন, অন্যায়-অবিচার, অসুন্দর, বেমানান, বেআদবি, পাপাচার ও নোংরামি থেকে সম্পূর্ণ পূতপবিত্র হবার জন্য তাড়িত করে। এর অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনা দেয়। এর অনুকূল আদর্শ পরিবেশ তৈরি করে।

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা

পাশ্চাত্যে তথাকথিত সভ্যতা সংস্কৃতি জনগণকে সত্যিকার কোনো স্বাধীনতা দিতে সক্ষম হয়নি। তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশগুলোর শাসনতন্ত্রে একথা স্পষ্ট করে লেখা থাকে যে, সরকার যেকোনো সময় জরুরি অবস্থা ঘোষণা কিংবা নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স জাতীয় আইনের সাহায্যে ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করতে পারে। নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্টকালের জন্য বিনা বিচারে বন্দী করে রাখার অধিকারও এ সরকারের জন্য সুরক্ষিত। বিশেষত জরুরি অবস্থায় সমস্ত জনগণ সরকারেরই নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বাধীনে চলে যেতে বাধ্য হয় তাতে ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। অন্যদিকে নারী ও পুরুষের সমতার নামে নারীর মর্যাদা সেখানে চরমভাবে ভুলণ্ঠিত।আর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র সেখানে আত্মকেন্দ্রিকতার নামান্তর বৈ কিছুই নয়। সেখানে কেউ কারোর জন্য এক বিন্দু সহানুভূতি বোধ করে না। পারস্পরিক প্রেম ভালবাসা ও সহানুভূতি কর্পূরের মত উবে গেছে সে সমাজ থেকে। আত্মহত্যার ঘটনা সেখানে এক নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু ইসলামী সংস্কৃতি এ অমানবিক বন্যতার প্রশ্রয় দেয়নি।

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র ও সমাজ স্বার্থের মাঝে এখানে ভারসাম্যপূর্ণ এক সীমারেখা অঙ্কিত। যার ফলে এ দুটি দিকই পরস্পরের জন্য রহমত হয়ে ওঠে।মানুষের মৌল অধিকারে কোন বৈষম্য বা তারতম্য এখানে স্বীকৃত নয়। প্রত্যেকেরই স্থান ও মর্যাদা সুনির্দিষ্ট এই সংস্কৃতিতে। এতে কমবেশি করার এতোটুকু অবকাশ নেই। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র হরণ করার অধিকার এখানে কাউকেই দেয়া হয়নি। ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর অকারণ সরকারি নিয়ন্ত্রণ আরোপের অধিকার কারো নেই। প্রত্যেকের জন্যেই যথোচিত কাজের ওশীয় প্রতিভার বিকাশ সাধনের অবাধ সুযোগ এখানে স্পষ্টভাবে স্বীকৃত। জনগণের সম্পদ পরিমাণে কমবেশি হতে পারে কিন্তু তাদের মৌলিক মানবীয় প্রয়োজন অপূর্ণ থাকার কোন কারণ ঘটতে পারে না এ সমাজে।

উদারতা, জ্ঞানালোক ও গতিশীল জীবনচেতনা

ইসলামি সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি এক স্বচ্ছ, উদার ও গতিশীল জীবনচেতনার প্রাণবন্ত বহিঃপ্রকাশ। ইসলামি সংস্কৃতি এমন একটি সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে উৎসারিত, যার মূল ভিত্তি হলো আল্লাহভীতিপূর্ণ সদাচার। ইসলামে বর্ণ, পেশা, পদ, রক্ত, গোত্র, সম্পদ ইত্যাদির দ্বারা সামাজিক বা মানবিক মর্যাদা নির্ধারিত হয় না, তাকওয়া বা আল্লাহভীতিই সেখানে মর্যাদার মাপকাঠি। কোরআন ও হাদিসের বহু স্থানে এই কথার প্রতিধ্বনি হয়েছে বারবার।

বিদায় হজের ঐতিহাসিক বাণীতে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

‘হে মানুষ সকল, জেনে রেখ! নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক একজন এবং তোমাদের পিতাও একজন। অতএব, কোনো অনারবের ওপর আরবের এবং কোনো আরবের

ওপর অনারবের প্রাধান্য নেই। অনুরূপভাবে কালো বর্ণের ওপরে সাদা বর্ণের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং সাদা বর্ণের ওপর কালো বর্ণের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তবে শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হয় শুধু তাকওয়ার মাধ্যমে।' (মুসনাদে আহমদ: ২২৩৯৯)

কোনো অঞ্চলিক, জাতীয়, বংশীয় বা গোত্রীয় সংস্কৃতি নয়; ইসলামি সংস্কৃতি; বরং তা হচ্ছে বৃহত্তর মানবীয় সংস্কৃতি। তাওহিদের বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত এক মোমিন রিসালাতের বিশ্বাস ও অনুবর্তিতায় আখেরাতের বোধে হন বলিষ্ঠ। তিনি যে কালে, যে দেশে, যে সমাজে থাকুন, ইসলামি সংস্কৃতি তাকে আপন মাতৃক্রোড়ে দুগ্ধদান করবে। তিনি যে বর্ণের হোন, যে গোত্রের হোন, যে ভূখণ্ডের হোন। ইসলামি সংস্কৃতির সর্বজনীনতা গোটা বিশ্বের প্রতিটি মানবগোষ্ঠীকে নিজের পরিসরে জায়গা দেয়, জায়গা দিতে প্রস্তুত।

এ সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো জ্ঞানশীলতা। জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, বিজ্ঞান ও গবেষণাকে এ সংস্কৃতি কত গভীরভাবে, কত ব্যাপকভাবে এবং কত তীব্রভাবে প্রণোদিত করে, তার সাক্ষ্য কোরআন-সুন্নাহ থেকে নিয়ে মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগে ব্যাপক ও বিস্তর। কুরআনের প্রথম বানী-

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ۚ
"পড় তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন- ",

(সূরা আলাকঃ ১)

এ সংস্কৃতিতে নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা যেভাবে গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি জ্ঞানীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ এখানে অভিষ্ঠ। ইসলামি সমাজ মানেই জ্ঞানালোকিত, নৈতিক ও প্রাগ্রসর এক সমাজ। কালের প্রবাহে এ সংস্কৃতিতে অচলাবস্থা আসার সুযোগ নেই।

কারণ তাতে আছে কোরআন-সুন্নাহর স্থিতিস্থাপকতা, সঙ্গে আছে জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিশীল চলমানতা। জীবনের পরিসর যতটা, জীবন যেখান থেকে যেখানে যায়, সবখানেই এ সংস্কৃতির অভিগমন রয়েছে। প্রতিটি পরিবর্তিত বাস্তবতাকে নিজের গলনপাত্রে সিদ্ধ করতে পারে এ সংস্কৃতি, নিজস্ব মূলনীতির অনুকূলে। ফলে গতিশীল জীবনের কোনো মাত্রা থেকে সে পিছিয়ে থাকে না। সে নিত্যই চলমান, যেমন চলমান মানবজীবন।

ইসলামী সংস্কৃতি তার আপন বৈশিষ্ট্য ও মহিমায় ভাস্বর। যেহেতু ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন। তাই মানব জীবনের কল্যাণকর সকল কর্মকান্ডই এ সংস্কৃতির আওতাভুক্ত। পবিত্র কুরআনে এ সংস্কৃতির বিস্তারিত রূপ উদ্ভাসিত হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মহান শিক্ষা ও জীবনাচরণের মাধ্যমে তা পুরোপুরি প্রতিফলিত হয়েছে।

ইসলামী সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি

ইসলামী সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে চূড়ান্ত সাফল্যের জন্য প্রস্তুত করা। অর্থাৎ মানুষ মহান আল্লাহর খলীফা হিসেবে এ পৃথিবীতে কুরআন সুন্নাহর নির্দেশানুযায়ী তার সকল কর্মকান্ড পরিচালনা করবে। এবং এরই আলোকে মানবাত্মার সার্বিক উৎকর্ষ ও উন্নতি সাধন করে পরকালের মুক্তি অর্জন করবে। কুরআনের ভাষায়, একেই 'তাযকিয়া' বলা হয়েছে। আর তাই ইসলামী সংস্কৃতি।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মূল দর্শন হলো, এ জীবন কয়েকটি মৌল উপাদানের উদ্দেশ্যহীন সংমিশ্রণের ফলে অস্তিত্ব লাভ করেছে। এর কোন লক্ষ্য নেই নেই কোন পরিণতি। এসব মৌল উপাদানের পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ারই নাম মৃত্যু। এবং মৃত্যুর পর কিছুই নেই- আছে শুধু অন্তহীন শূণ্যতা।

ইসলামী সংস্কৃতি সমাজের ব্যক্তিদের মাঝে এমন শৃংখলা গড়ে তোলে, যাতে ব্যক্তি চরিত্র ও সমাজ সংস্থায় আল্লাহর ভারসাম্যপূর্ণ গুণাবলীর প্রতিফলন ঘটে। পশ্চিমা সংস্কৃতিতে জীবন যেহেতু একটা আকস্মিক ঘটনা মাত্র। এ জন্য দুনিয়ার যেমন স্থায়ী মূল্যমান নেই। নেই প্রতিফল পাওয়ার কোন ব্যবস্থা। সুতরাং খাও-দাও ফুর্তি করো। এটিই এ সংস্কৃতির প্রকৃত দর্শন।

ইসলামী সংস্কৃতিতে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, স্রষ্টার একত্ব ও মিল্লাতের অভিন্নতার ভিত্তিতে এক ব্যাপকতর ঐক্য ও সম্মিলিত ভাবধারা গড়ে ওঠে। এর ফলে মানব সমাজ থেকে সবরকমের জোর-জবরদস্তি, স্বেচ্ছাচারিতা, যুলুম-শোষণ ও হিংসা-বিদ্বেষ দূরীভুত হয়ে যায় এবং পরস্পরের আন্তরিক ও নি:স্বার্থ ভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠে।

পশ্চিমা সংস্কৃতি যেহেতু ব্যক্তি স্বার্থ ও সুখবাদী দর্শনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠেছে, সেজন্যে এরই ফলে বিশ্বের ব্যক্তি ও বিভিন্ন জাতির মাঝে পারস্পরিক দ্বন্দ-সংগ্রাম, হিংসাদ্বেষ, রক্তারক্তি ও কোন্দল-কোলাহল অনিবার্য হয়ে ওঠে। ফলে চারদিকে চরম বিপর্যয় ও অশান্তি বিরাজমান থাকে। শাসক ও শাসিত এবং বিজয়ী ও বিজিতের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

পাশ্চাত্যের বস্তবাদী দর্শনে সংস্কৃতি নিছক চিত্ত-বিনোদনের উপায় ও মাধ্যম বলে বিবেচিত। আর এর প্রাথমিক উপকরণ হলো অশ্লীল গান-বাজনা ও নৃত্য। পরবর্তীতে এর সাথে যোগ হলো যুবক-যুবতীর প্রেমাভিনয়। শুধু এখানেই এর শেষ নয়। এ সংস্কৃতিতে নির্লজ্জতা ও নগ্নতা প্রদর্শন শিল্প-সৌকর্যেরই পরাকাষ্ঠা হয়ে দাঁড়ালো। যে যত বেশি নির্লজ্জতা প্রদর্শন করতে পারবে সেই হবে তত বেশি সার্থক শিল্পী। সংস্কৃতি জগতে সেই হবে একজন বিরাট হীরো।

কিন্তু ইসলামী সংস্কৃতি তার আপন মহিমায় ভাস্বর। এ সংস্কৃতির অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলোই তাকে এ স্বাতন্ত্র্য মর্যাদা দান করেছে। ইসলামী সংস্কৃতিতে বেহায়াপনা ও নিলর্জ্জতার কোন স্থান নেই। এতে লজ্জা-শরমকে ঈমানের অঙ্গ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতিকে সম্মানের মানদন্ড নিরুপণ করা হয়েছে।

এ সংস্কৃতির লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে পরিচ্ছন্ন, সুস্থ, মার্জিত, ভদ্র এবং আদর্শবান ও সুরুচিসম্পন্ন চরিত্রবান রূপে গড়ে তোলা। যাতে মানুষ আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাহ হিসেবে তার খিলাফতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হয়। শুধু চিত্ত বিনোদনই ইসলামী সাংস্কৃতির লক্ষ্য নয়। আবার একে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষাও করা হয়নি, বরং যে সব চিত্ত বিনোদনে শরীআতের সীমা লংঘিত হয় এবং যা মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হয়, তাই ইসলামে নিষিদ্ধ।

নারী-পুরুষের সমঅধিকার এবং ইসলাম

পাশ্চাত্যের নারী-পুরুষ সমতার ধারণা ভুল। ব্যক্তি রচিত মতবাদের ভিত্তিতে চিন্তা করলে এর সমাধান কখনো পাওয়া যাবে না। সমতার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হলে ভাবতে হবে সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর দেয়া নিয়মনীতি অনুযায়ী। সেখানে নারী পুরুষ সমান নয় বরং পুরুষের তুলনায় নারীর মর্যাদা অধিকার ও সম্মান অনেকাংশে ইসলাম বেশি দিয়েছে।

যদি নারী অধিকারের কথা বলতে চাই, তাহলে স্পষ্ট ভাবে বলতে হবে নারীরা পুরুষের চেয়েও অধিক পরিমাণ অধিকার ভোগ করছেন। এখানে মর্যাদা, ক্ষমতা, অধিকার ও দায়িত্ব নিয়ে মানুষে ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। নারীর মর্যাদা ক্ষমতা ও অধিকার পুরুষের চেয়ে বেশি। কিন্তু দায়িত্ব কম। আবার নারীর একটি দায়িত্ব আছে যা শত পুরুষের দায়িত্বের চেয়ে বড় ও ভারী। এর নাম মাতৃত্ব। এটি কোনো পুরুষ পালন করতে পারবে না। কখনো সম্ভব নয়। মর্যাদাও এমনই।

প্রতিটি শিশু ও নারী পুরুষের কাছে আমানত, তাদের ভরণপোষণ থেকে শুরু করে সবকিছুই পুরুষের উপর ন্যস্ত করেছে ইসলাম। তাহলে বলা যায় ইসলাম তাদেরকে সর্বোচ্চ মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে।

যারা বলে ইসলাম নারী অধিকার দেয়নি, তাদের উচিত এই আয়াতের প্রতি দৃষ্টি দেয়া। যেখানে পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন,

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

'নারীরা তোমাদের পোশাকস্বরূপ, তোমরাও নারীদের পোশাকস্বরূপ।'

(সুরা বাকারাহ, আয়াত ১৮৭)

কোরআনে সুরা নিসার ১৯ নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা আবারো ইরশাদ করেন,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

'নারীদের সঙ্গে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো।'

ইসলাম নারীকে যে অধিকার দিয়েছে তা পুরুষ অপেক্ষায় কয়েকগুণ বেশি। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে পশ্চিমাদের রঙিন চশমায় এসব দেখা যায় না। তারা নারী-পুরুষের সমান অধিকার বলতে বোঝায়, অবাধ মেলামেশা। যেটাকে ইসলাম হারাম করে দিয়েছে। এর মাঝে ছড়িয়ে পড়ে ফেতনা ফাসাদ।

নারীবাদী স্লোগানে যারা বিশ্বাসী, তারা আবারো ফিরতে চাচ্ছে জাহেলিয়াতের সমাজে। যেখানে নারীকে কেবল ভোগসামগ্রী মনে করা হতো। ন্যূনতম সম্মান ইজ্জত ছিলো না নারীদের। বরং মেয়ে সন্তান জন্মনিলে সাথে সাথে তাকে জীবিত দাফন করা হতো। সে সময়ে মানবতার মুক্তির দূত মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব ঘটে। তিনি নারীকে সম্মান ও ইজ্জত ফিরিয়ে দিয়েছে। যেমন আমরা লক্ষ্য করলেই দেখতে পাই।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, একবার এক লোক মহানবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আমার সদ্ব্যবহার পাওয়ার বেশি অধিকারী কে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমার মা।' ওই লোক জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে? তিনি উত্তর দিলেন 'তোমার মা।' ওই লোক আবারো জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে? এবারো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, 'তোমার মা।' (সহিহ বুখারি)

নারীকে ইসলাম কী পরিমাণ সম্মান ও অধিকার দিয়েছে, তার আরেকটা ঘটনা উল্লেখ করলে পরিষ্কার বোঝা যাবে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানার বিখ্যাত এক ঘটনার কথা আমরা জানি। মায়ের সেবা করার কারণে হজরত ওয়াইস করনি (রা.) প্রিয় নবীর জামানায় থেকেও সাহাবি হতে পারেননি। একবার ওয়াইস করনি (রা.) নবীজির কাছে খবর পাঠালেন ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনার সঙ্গে আমার দেখা করতে মন চায়; কিন্তু আমার মা অসুস্থ, এখন আমি কী করতে পারি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর পাঠালেন, আমার কাছে আসতে হবে না। আমার সঙ্গে সাক্ষাতের চেয়ে তোমার মায়ের খেদমত করা বেশি জরুরি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর গায়ের একটি মোবারক জুব্বা ওয়াইস করনির জন্য রেখে যান। তিনি বলেন, মায়ের খেদমতের কারণে সে আমার কাছে আসতে পারেনি। আমার ইন্তেকালের পরে তাকে আমার এই জুব্বাটি উপহার দেবে। জুব্বাটি রেখে যান হজরত ওমর (রা.) এর কাছে। আর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে ওমর! ওয়াইস করনির কাছ থেকে তুমি দোয়া নিয়ো।

একইভাবে আধ্যাত্মিক মহিমা অর্জনের ক্ষেত্রেও নারীর কর্তব্য রয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে,

إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَٰتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْقَٰنِتِينَ وَٱلْقَٰنِتَٰتِ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلصَّٰدِقَٰتِ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰبِرَٰتِ وَٱلْخَٰشِعِينَ وَٱلْخَٰشِعَٰتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَٰتِ وَٱلصَّٰٓئِمِينَ وَٱلصَّٰٓئِمَٰتِ وَٱلْحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَٰفِظَٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

‘এ কথা সুনিশ্চিত, যে পুরুষ ও নারী মুসলিম মুমিন, হুকুমের অনুগত, সত্যবাদী, সবরকারী, আল্লাহর সামনে বিনত, সাদকা দানকারী, রোজা পালনকারী, নিজেদের সম্ভ্রমের হেফাজতকারী এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণকারী, আল্লাহ তাদের জন্য মাগফিরাত ও প্রতিদানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।’

(সুরা আহজাব, আয়াত: ৩৫)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের ভাষণের মধ্য দিয়েও নারীদের প্রতি সম্মানের প্রকাশ করেন।

বিদায় হজে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "হে মানুষ! নারীদের সম্পর্কে আমি তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি। তাদের সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণ করো না। তাদের ওপর তোমাদের যেমন অধিকার রয়েছে, তেমনি তোমাদের ওপরও তাদের অনুরূপ অধিকার রয়েছে। সুতরাং তাদের কল্যাণের দিকে সবসময় খেয়াল রেখো।"

বিদায় হজের বাণী থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী ও পুরুষ উভয়কেই যথাযথ মর্যাদা দিয়ে গেছেন। তিনি পুরুষকে নারীর চেয়ে বেশি নয় বরং উভয়কেই অধিকারের দিক হতে যথাযথ মর্যাদা ও অধিকারের আসনে বসিয়েছেন।

এছাড়াও কেবল ইসলামি উম্মাহর ইমারত (খেলাফতের প্রধান) ও মুসলিম জামাতের ইমামত (পুরুষের জামাতের ইমামতি) ছাড়া নারী অন্য সবকিছুতেই ভূমিকা রাখতে পারে। এটি নারীর প্রতি অবজ্ঞা নয়, বরং মাতৃত্বের বৈশিষ্ট্যের প্রতি পরম শ্রদ্ধা। তবে অধিক স্নেহ, নম্রতা ও কোমলতা এবং ক্ষেত্র বিশেষে ভীরুতা, অমনোযোগিতা, পরিবেশ জ্ঞানের স্বল্পতা দরুন বোধের সীমাবদ্ধতার জন্য (অল্প ব্যতিক্রম ছাড়া) সাধারণত নারীরা সবসময় সবক্ষেত্রে স্বাভাবিক মন-মানসিকতা ধরে রাখতে পারে না। তাই, গুরুত্বপূর্ণ কিছু ক্ষেত্রে তাদের সাক্ষ্য দুজন মিলে একজনের সমান করা হয়েছে। তবে এটিও আইনগত ক্ষেত্র ছাড়া জীবনের সব ক্ষেত্রে নয়। এটি উচ্চতর প্রজ্ঞাময় মহান সৃষ্টিকর্তার সিদ্ধান্ত। প্রকৃতির ওপর মানুষের যেমন হাত নেই, অভিযোগ নেই, ঠিক তেমনই শরিয়তের ওপরও মানুষের হাত নেই, অভিযোগ নেই, থাকতেও পারে না।

সুতরাং ইসলামের আলোয় যখন আপনি সব বিষয় দেখবেন, তখন মনে আর কোনো প্রশ্ন থাকবে না। কারণ, ইসলাম মহান সৃষ্টিকর্তার বিধান। বান্দাদের সম্পর্কে তার

চেয়ে ভালো আর কে জানে। কিসে তাদের মঙ্গল, তা তিনি ছাড়া আর কে বুঝবে। মুসলিম নারীরা কত সম্মানে অবস্থান করছে, তা বিশ্লেষণ করে দেখলে দুনিয়ার মানুষ আর যাই করুক, মুসলিম নারীদের জীবন নিয়ে ঈর্ষা করবেই।

এর থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম ইসলাম নারীকে যথাযথ অধিকার দিয়েছে, বরং ক্ষেত্র বিশেষ এর চেয়েও বেশি।

মানবকল্যাণমূলক অর্থনীতিব্যবস্থা

পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের বিপরীতে ইসলাম মানবজাতির জন্য একটি সুন্দর বিকল্প ব্যবস্থা উপহার দিয়েছে। ইসলামে মানুষকে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে ব্যক্তিকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে এবং তার সামনে ভালো ও মন্দ দুটি পথই খুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে মানুষ এই স্বাধীনতা একটি নৈতিক মানের ভেতর দিয়েই শুধু ভোগ করতে পারে। এই স্বাধীনতা অনিয়ন্ত্রিত নয় মোটেও। কেননা মানুষকে তার কর্মকাণ্ডের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা মানুষের কল্যাণের জন্যই দুনিয়ার সব কিছু সৃষ্টি করেছেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। মানুষ এসব সম্পদ ব্যবহার করবে এবং এর কল্যাণ গ্রহণ করবে। তবে যাবতীয় অনৈতিকতামুক্ত হয়ে আল্লাহর এ সম্পদরাজি ব্যবহার করতে হবে। ইসলাম এমন এক অর্থব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে, যাতে সমাজের সব মানুষ তা থেকে কল্যাণ লাভ করতে পারে এবং এর ফলে সমাজের মানুষের মধ্যে সব ধরনের ব্যবধান, বৈষম্য ও শোষণ-পীড়ন দূরীভূত হয়। ইসলামী ব্যবস্থার কারণে অর্থসম্পদ কারো হাতে জমা হয়ে থাকতে পারে না, বরং তা প্রতিনিয়ত আবর্তিত হয়ে গোটা সমাজের মানুষের প্রয়োজনে ভূমিকা পালন করে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহর নির্দেশনা হচ্ছে,

كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ

‘তোমরা সম্পদ এমনভাবে বণ্টন করবে, যাতে ধন-সম্পদ তোমাদের মধ্যকার বিত্তবানদের মাঝেই শুধু আবর্তিত না থাকে।’

(সূরা হাশর: ৭)

ইসলামী অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হলো, সব সম্পদ আল্লাহর। মানুষ সেটি খোদায়ি বিধান মতে ন্যায়-ইনসাফপূর্ণভাবে ব্যবহার করবে। এ ক্ষেত্রে সব নৈতিক মানদণ্ড মেনে চলবে। ধোঁকা, প্রতারণা, মজুদদারি, ওজনে কম দেওয়াসহ সুদ দেওয়া-নেওয়া থেকে বিরত থেকে মানুষ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে।

এছাড়া দারিদ্র্য বিমোচন, সম্পদের সুষম বন্টন ব্যবস্থা নিশ্চিতের জন্য ইসলামে যাকাত ও সাদাকাহর বিধান রয়েছে। সম্পদ যেনো শুধু ধনীদের কুক্ষিগত না থেকে গরীবদের মাঝেও প্রবাহিত হয় সেই লক্ষ্যে যাকাতকে ফরয করা হয়েছে। যাকাত ধনীদের সম্পদে গরীব, দুঃস্থ ও অসহায়দের হক।

আল্লাহতায়ালা ঘোষণা করেছেন,

وَفِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ

‘আর তাদের (ধনীদের) সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।“

(সূরা আয যারিয়াত: ১৯)

যাকাত গরীবের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ফলে বাজারে চাহিদা বৃদ্ধি পায়। যা যোগান বৃদ্ধিতে চাপ প্রয়োগ করে। যোগান বাড়াতে প্রয়োজন হয় বিনিয়োগ বাড়ানোর। গড়ে ওঠে নতুন কারখানা। এতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়, বেকারত্ব হ্রাস পায়। বিনিয়োগ বাড়ালে মুনাফা বৃদ্ধি পায়। কাজেই সম্পদও বৃদ্ধি পায়। ফলে যাকাতও বেড়ে যায়। এভাবেই পুরো অর্থনীতিকে চালিয়ে নিয়ে যায় যাকাত।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِن تُبْدُوا۟ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّـَٔاتِكُمْ ۗ

'যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-সদকা করো, তবে তা কতই না উত্তম। আর যদি গোপনে ফকির-মিসকিনকে দান করে দাও, তবে আরো বেশি উত্তম। আর তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন।'

(সূরা বাকারা, আয়াত-২৭১)

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ

"তারা আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে,তারা কী ব্যয় করবে? (আল্লাহ বলেন) জানিয়ে দিন, যা তোমাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত।"

(সূরা বাকারা, আয়াত-২১৯)

প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ দান সাদাকাহ করার ব্যাপারে কুরআনে অসংখ্য আয়াত রয়েছে। হাদীসেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দান সাদাকাহর গুরুত্ব ও দান সাদাকাহকারীর মর্যাদা ও পুরস্কারের ঘোষনা দিয়েছেন।

বুখারি ও মুসলিম শরিফে এসেছে-যারা গোপনে দান করেন, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তাদের আরশের নিচে ছায়া ও শান্তি দান করবেন। নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "দান-সদকা গুনাহ এমনভাবে মিটিয়ে ফেলে যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে ফেলে। দান জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচায়।" সুবহানাল্লাহ। তিনি আরও বলেন, "দান করলে বিপদ কেটে যায় আর হায়াত বাড়ে।"

বুখারি ও মুসলিম শরিফে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "খেজুরের একটি অংশ দান করে হলেও তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা কর।"

ইসলামী সংস্কৃতির কাঠামো

এ কাঠামোর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

এক: এ সংস্কৃতির ব্যবস্থাপনা একটি রাজ্যের ব্যবস্থাপনার মতো। এতে আল্লাহর মর্যাদা সাধারণ ধর্মীয় মত অনুসারে নিছক একজন 'উপাস্যে'র মতো নয়। বরং পার্থিব মত অনুযায়ি তিনি সর্বোচ্চ শাসকও। প্রকৃতপক্ষে তিনি হচ্ছেন এ বিশাল রাজ্যের বাদশাহ শাহানশাহ। রসূল তাঁর প্রতিনিধি। কুরআন তাঁর আইন গ্রন্থ। যে ব্যক্তি তাঁর বাদশাহীকে স্বীকার করে তাঁর প্রতিনিধির আনুগত্য এবং তাঁর আইন গ্রন্থের অনুসরণ করে সে এই রাজ্যের প্রজা। মুসলমান হওয়ার মানেই হচ্ছে এই যে, সেই বাদশাহ তাঁর প্রতিনিধি ও আইন গ্রন্থের মাধ্যমে যে আইন বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন-তার কার্যকরণ ও যৌক্তিকতা বোধগম্য হোক কি না হোক-বিনা বাক্য ব্যয়ে তার স্বীকার করতে হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর এ সর্বোচ্চ ক্ষমতা এবং তাঁর আইন বিধানকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সিদ্ধান্তের ঊর্ধে স্থান দিতে স্বীকৃত না হবে এবং তাঁর আদেশাবলী মানা বা না মানার অধিকারকে নিজের জন্যে সুরক্ষিত রাখবে, তার জন্যে রাজ্যের কোথাও এতটুকু স্থান নেই।

দুই: এ সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে চূড়ান্ত সাফল্যের (অর্থাৎ পরকালীন বিচারে বিশ্ব প্রভুর সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হওয়ার জন্যে প্রস্তুত করা আর তার দৃষ্টিতে এ সাফল্য অর্জনটা বর্তমান জীবনে মানুষের নির্ভুল আচরনের ওপর নির্ভরশীল। পরন্তু চূড়ান্ত ফলাফলের দৃষ্টিতে কোন্ সব কাজ উপকারী, আর কোন্ সব কাজ অপকারী, তা জানা মানুষের সাধ্য নয়, বরং আখেরাতে ফয়সালাকারী আল্লাহই তা উত্তমরূপে অবহিত। এ

কারনেই এ সংস্কৃতি জীবনের সকল বিষয়াদিতে আল্লাহর নির্দেশিত পন্থা অনুসনণ করার এবং নিজের কর্ম স্বাধীনতাকে খোদায়ী শরীয়ত দ্বারা সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত করার জন্যে মানুষের কাছে দাবী জানায়। অনুরূপভাবে এ সংস্কৃতি হচ্ছে দ্বীন ও দুনিয়ার এক মহত্তম সমন্বয়। একে প্রচলিত সংকীর্ণ অর্থে 'ধর্ম' নামে আখ্যায়িত করা চলে না। এ হচ্ছে একটি ব্যাপকতর জীবনব্যবস্থা বা মানুষের চিন্তা-কল্পনা, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, পারিবারিক কাজ-কর্ম, সামাজীক ক্রিয়া-কান্ড, রাজনৈতিক কর্মধারা, সভ্যতা ও সামাজিকতা সবকিছুর ওপরই পরিব্যাপ্ত। আর এ সমস্ত বিষয়ে যে পদ্ধতি ও আইন-বিধান আল্লাহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তারই সামষ্টিক নাম হচ্ছে 'দ্বীন ইসলাম' বা 'ইসলামী সংস্কৃতি'।

তিন: এ সংস্কৃতি কোন জাতীয়, (ভৌগলিক বা ভাষাগত অর্থে) দেশীয় বা গোত্রীয় সংস্কৃতি নয়। বরং সঠিক অর্থে এটি হচ্ছে মানবীয় সংস্কৃতি। এ মানুষকে শুধু মানুষ হিসেবেই আহবান জানায়। যে ব্যক্তি তাওহীদ, রিসালাত, কিতাব ও পরকালের প্রতি ঈমান পোষণ করে, তাকেই সে নিজের চৌহদ্দির মধ্যে গ্রহণ করে। এমনিভাবে এ সংস্কৃতির এক বিশ্বব্যাপী উদার জাতীয়তা গঠন করে –যার মধ্যে বর্ণ-গোত্র-ভাষা নির্বিশেষে সকল মানুষই প্রবেশ করতে পারে। তার মধ্যে রয়েছে সমগ্র দুনিয়ার বুকে বিস্তৃত হবার মতো অনন্য যোগ্যতা। সমগ্র আদম সন্তানকে একই জাতীয় সূত্রে সম্পৃক্ত করার এবং তাদের সবাইকে একই সংস্কৃতির অনুসারী করে তোলার মতো যোগ্যতারও সে অধিকারী। কিন্তু এ বিশ্বব্যাপী মানবীয় ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা দ্বারা তার আসল লক্ষ্য শুধু নিজ অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করারই নয়, বরং মানব জাতির রব তার মঙ্গল ও ভালাইর জন্যে যে নির্ভুল জ্ঞান ও কর্মনীতি দান করেছেন, সমগ্র মানুষকে তার সুফলের অংশীদার করে তোলাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। এ কারনেই এ ভ্রাতৃসংঘে শামিল হবার জন্যে প্রথমত সে ঈমানের শর্ত আরোপ করেছে এবং সেই সাথে যারা

আল্লাহর সর্বোচ্চ ক্ষমতার সামনে মাথা নত করতে প্রস্তুত এবং আল্লাহর রসূল ও তাঁর কিতাবের দ্বারা নির্ধারিত সীমারেখা ও আইন-বিধান পালন করতে ইচ্ছুক, কেবল তাদেরকেই এ সংঘের জন্যে মনোনীত করেছে। কারণ এ ধরনের লোকেরাই শুধু (তারা সংখ্যায় যতো অল্পই হোক) এ সাংস্কৃতিক ব্যবস্থায় খাপ খাওয়াতে পারে এবং এদের দ্বারাই একটি নির্ভুল ও সুদৃঢ় জীবন-ব্যবস্থা কায়েম হতে পারে। এ ব্যবস্থায় অবিশ্বাসী, মুনাফেক বা ক্ষীণ বিশ্বাসী লোকদের স্থান পাওয়া এর শক্তির লক্ষণ নয়, বরং তা দুর্বলতারই লক্ষণ।

চার: সীমাহীনতা ও বিশ্বজনীনতার সাথে এ সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর প্রচন্ড নিয়মানুবর্তিতা (Discipline) এবং শক্তিশালী বন্ধন। এর সাহায্যেই সে নিজের অনুসারীদেরকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক দিক থেকে নিজস্ব আইনের অনুগত করে তোলে। এর কারণ এই যে, আইন প্রণয়ন ও সীমা নির্ধারণ করার পূর্বে সে আইনের অনুসরণ ও সীমা সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করে নেয়। অন্য কথায়, আদেশ দেয়ার পূর্বেই সে আদেশ দ্বারা কার্যকরী হওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করে। এ জন্যে সর্বপ্রথমে সে মানুষের আল্লাহর প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেয়। তারপর তাকে এ নিশ্চয়তা দেয় যে, রসূল ও কিতাবের মাধ্যমে যে বিধান দেয়া হয়েছে তা আল্লাহরই বিধান এবং তার আনুগত্য ঠিক আল্লাহরই আনুগত্য। পরন্তু তার মনের ভেতর সে এক অতন্দ্র প্রহরী নিযুক্ত করে দেয়-সে সর্বদা ও সর্বাবস্থায় তাকে খোদায়ী বিধান পালনে উদ্বুদ্ধ করে, তার বিরুদ্ধাচরণের জন্যে তিরষ্কার করে এবং পরকালীন শাস্তির ভয় দেখায়। এভাবে যখন প্রতিটি ব্যক্তির মন ও বিবেকের ভেতর এ কার্যকর শক্তিকে বদ্ধমূল করে নিজের অনুসারীদের মধ্যে স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে আইনানুবর্তন, বিধি-নিষেধ পালন ও সদগুণরাজিতে বিভূষিত হওয়ার মতো যোগ্যতার সৃষ্টি করা হয়, তখনি সে তাদের সামনে নিজস্ব আইন বিধান পেশ করে, তাদের জন্যে কর্মসীমা নির্ধারণ করে, তাদের

জন্যে জীবন যাত্রা প্রণালী তৈরী করে এবং নিজস্ব লক্ষ্য হাসিলের জন্যে তাদের কাছে কঠোরতর ত্যাগ স্বীকারের দাবী জানায়। বস্তুত এটা অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক কর্মপন্থা, এর চেয়ে বিচক্ষণ পন্থা আর কিছুই হতে পারে না। এ পন্থায় ইসলামী সংস্কৃতি যে বিরাট প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ করেছে, অন্য কোন সংস্কৃতি তা লাভ করতে পারেনি।

পাঁচ: পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে এ সংস্কৃতি এক নির্ভুল সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে এবং এক সৎ ও পবিত্র জনসমাজ (Society) গড়ে তুলতে চায়। কিন্তু এর অন্তর্ভুক্ত লোকেরা উত্তম চরিত্র ও সদগুনরাজতে বিভূষিত না হওয়া পর্যন্ত এরূপ সমাজ গঠন সম্ভবপর নয়। এ কারণেই এর সভ্যদের ব্যক্তি চরিত্র সংশোধন করা একান্ত প্রয়োজন, যাতে করে অতি স্বাভাবিকভাবে সৎ কর্মরাজির অনুশীলন হওয়ার মতো সুদৃঢ় চরিত্র তাদের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে। বস্তুত ইসলাম তার সাংস্কৃতিক ব্যবস্থায় এ নিয়মটির প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রেখেছে। লোকদের ট্রেনিং-এর জন্যে ইসলাম সর্বপ্রথম তাদের মধ্যে ঈমান ও প্রত্যয়কে বদ্ধমূল করে দেয়-কারণ তাদের মধ্যে উঁচুমানের মযবুত চরিত্র সৃষ্টি করার এটাই হচ্ছে একমাত্র পন্থা। এ ঈমানের বলেই সে লোকদের মধ্যে সততা, বিশ্বস্ততা, সচ্চরিত্র, আত্মনুশীলন, সত্য প্রীতি, আত্মসংযম, সংগঠন, বদান্যতা, উদার দৃষ্টি, আত্মসম্ভ্রম, বিনয়-নম্রতা, উচ্চাভিলাস, সৎসাহস, আত্মত্যাগ, কর্তব্যবোধ, ধৈর্যশীলতা, দৃঢ়চিত্ততা, বীর্যবত্তা, আত্মতৃপ্তি, নেতৃ আনুগত্য আইনানুবর্তিতা ইত্যাকার উৎকৃষ্ট গুনরাজির সৃষ্টি করে। সেই সাথে তাদের সংঘবদ্ধতার স্বাভাবিক পরিণামে যাতে একটি উৎকৃষ্ট জনসমাজ গড়ে উঠে, তাদেরকে ঠিক তেমনিভাবে যোগ্য করে তোলে।

ছয়: এ সংস্কৃতির ঈমান তথা প্রত্যয়বাদে একদিকে সচ্চরিত্র ও সৎ গুনরাজি সৃষ্টি করায় এবং তা প্রতিপালন এবং সংরক্ষণের উপযোগী সকল শক্তি বর্তমান রয়েছে।

অন্যদিকে পার্থিব উপায়-উপকরণ উত্তমরূপে ব্যবহার করার ও আল্লাহর দেয়া শক্তি নিচয়কে সুষমভাবে প্রয়োগ করার জন্যে যোগ্য করে তোলার মতো শক্তিও এর ভেতরেই নিহিত রয়েছে। পরন্তু এ প্রত্যয়বাদই দুনিয়ার প্রকৃত উন্নতি করার জন্যে প্রয়োজনীয় উৎকৃষ্ট গুনাবলী মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে। এর মধ্যে মানুষের কর্মশক্তিকে সুসংহত করার এবং তাকে সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করার মতো প্রচন্ড শক্তি বর্তমান রয়েছে। সেই সাথে এ কর্মশক্তিকে সীমাতিক্রম করতে না দেয়ার এবং সত্যিকার কল্যাণ পথ থেকে বিচ্যুত হতে না দেয়ার শক্তিও এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। এভাবে যেসব গুনাবলী অন্যান্য ধর্মীয় ও পার্থিব প্রত্যয়ের মধ্যে পৃথক পৃথকভাবে পাওয়া যায়, ইসলামী প্রত্যয়বাদ তা সবই একত্রে ও উৎকৃষ্টরূপে বর্তমান রয়েছে। আর যেসব বিকৃতি বিভিন্ন ধর্মীয় ও পার্থিব প্রত্যয়ে লক্ষ্য করা যায় সেইসব থেকে এ প্রত্যয়বাদ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

পরিশেষ

সংস্কৃতি আসলে কি? সংস্কৃতি বলতে বোঝায় সংস্কার, সংশোধন, পরিশুদ্ধকরন ও পরিচ্ছন্নতা বিধান। কিন্তু আধুনিক সমাজে সংস্কৃতি বা সংস্কৃতি চর্চা বলতে মানুষের মনে আসে চিত্র-শিল্প, কাব্য, সঙ্গীত, নাচ- গান, অর্থাৎ চিত্ত বিনোদন, সুখ-আনন্দ লাভ বিষয়ক বিষয়সমূহ। অনেকের তাই ধারনা সংস্কৃতি হতে হবে 'রস- ঘন', চিত্তবিনোদনে ভরপুর। আর তাদের কাছে ইসলামি সংস্কৃতি বিরস শুষ্ক। আসলেই কি তাই? রসের তো বিশেষ কোন রূপ নেই, এটি আপেক্ষিক। একজনের কাছে যা তৃপ্তিময় অন্যের কাছে তা বিরস হতেই পারে। আসল জিনিস হলো মনের তৃপ্তি। যেখানে যার মানসিক তৃপ্তি, তা-ই তাকে অফুরন্ত রসের যোগান দেয়। ইসলামি সংস্কৃতিতে মানুষকে এই রসের যোগান দেয়, মনের তৃপ্তি, স্বাদ ও আনন্দের অনুভূতি দেয় "আল্লাহর স্মরণ বা যিকির"।

কুরআনে আল্লাহ বলেছেন –

اَلَا بِذِكۡرِ اللّٰهِ تَطۡمَئِنُّ الۡقُلُوۡبُ ﴿۲۸﴾

জেনে রেখ, আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমেই দিলের সত্যিকারের প্রশান্তি লাভ করা যায়।

(সূরা রা'দ: ২৮)

মনের তৃপ্তিই যদি কাম্য হয়, লক্ষ্য হয় মানসিক প্রশান্তি তা হলে ইসলামী সংস্কৃতিতে রয়েছে তার অপূর্ব সমাবেশ। তবে পার্থক্য হল এই যে, কেউ অতি মশলাদার উপাদেয় খাবার খেতে পছন্দ করে সেটা যতই অস্বাস্থ্যকর হোক আর কেউ কাঁচা বা আধসিদ্ধ তরকারি খেতে পছন্দ করে পুষ্টিকর হিসেবে।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে তুলনা করা যায় চটকদার আকর্ষণীয় রং বেরঙের মোড়কে উপস্থাপন করা অপুষ্টিকর, অস্বাস্থ্যকরই শুধু নয় বরং ক্ষতিকর খাবারের মত। তারা যতই গালভরা সুন্দর বৈশিষ্ট্যের নাম প্রচার করুক সেগুলোর ভেতরে রয়েছে অনৈতিক, ধ্বংসাত্মক প্রভাবসমৃদ্ধ উপাদান। ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, বাক স্বাধীনতার নামে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে টার্গেট করে কালিমা লেপন, জুলুম করা, সমঅধিকারের নামে ট্রান্সজেন্ডার, গে, লেসবিয়ানদের সমাজে স্বীকৃতি দেয়ার চেষ্টা, নারী অধিকারের নামে নারীদের পর্দার পোশাক ছিনিয়ে নিয়ে তাদের ধর্ষিতা হতে বাধ্য করা, আধুনিকতার নামে নগ্নতা – বেহায়াপনা - অশ্লীলতা ছড়ানো। এগুলোই পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা। আমরা যদি তাদের এই রূপের ব্যাপারে পূর্ন সতর্ক না হই তাহলে নিজেদের মার্জিত, পবিত্র, সততা ও ন্যায়পরায়নতা সমৃদ্ধ আদর্শ সংস্কৃতি গ্রহন না করে পাশ্চাত্যের চোখ ধাঁধানো আলোকচ্ছটায় অন্ধ হয়ে যাব। তাদের সংস্কৃতির প্রভাবে আমরা হারিয়ে ফেলবো আমাদের স্বকীয়তা, নিজস্বতা।

আমরা যেন পংকিলতাময় পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত না হয়ে নিজস্ব, সুস্থ-সুন্দর ইসলামী সংস্কৃতিকে চিনতে পারি, তাকে আঁকড়ে ধরতে পারি।, নিজের জীবনে এই সংস্কৃতির চর্চার মাধ্যমে দুনিয়ার সম্মান ও সফলতা অর্জন এবং আল্লাহ সুবহানু ওয়া তাআলার সন্তুষ্টি লাভ করতে পারি। সেই নিমিত্তেই আমি আমার গবেষনার জন্য এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করেছি।

যা কিছু কল্যাণকর উত্তম বিষয় আলোচনায় এসেছে তা কেবলই আমার রবের পক্ষ থেকে। আর যেসব ভুল ভ্রান্তি আমার লিখায়, এসেছে তার দায় আমারই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাকে পরবর্তীতে এই ভুলগুলো সংশোধন করার তওফিক

দান করুন। এই গবেষনার আলোচ্য বিষয় থেকে আমাকে এবং যারা পড়বেন তাদের সকলকে উপকৃত হওয়ার তওফিক দান করুন। আমিন।

তথ্যসূত্র

১। ‘শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি’, মাওলানা আবদুর রহীম, খায়রুন প্রকাশনী, জুন, ২০০০।

২। ‘ইসলামী সংস্কৃতির উজ্জ্বল নিদর্শন’, ড. মুস্তফা সুবায়ী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, নভেম্বর, ২০০৪।

৩। ‘চিন্তাপরাধ’, আসিফ আদনান, ইলমহাউজ পাবলিকেশন, মে, ২০১৯।

৪। https://banglalittlemag.wordpress.com/2011/06/01/**ইসলামী-সংস্কৃতি-উৎপত্তি**

৫। https://www.postposmo.com/bn/cultura-occidental/

৬। https://roar.media/bangla/main/world/cancel-culture-and-free-speech-debate

৭। https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/civilization-and-culture/150959/**ইসলামি-সংস্কৃতির-স্বরূপ-গুরুত্ব-ও-কতিপয়-বৈশিষ্ট**

৮। ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা, সাইয়েদ আবুল আ’লা মাওদুদী, আধুনিক প্রকাশনী, জুন, ১৯৭৯।

৯। https://www.sonalinews.com/m/religion/news/151427

১০। https://www.somewhereinblog.net/mobile/blog/chatmohor88/30276949

১১। https://www.deshrupantor.com/332181/**নৈতিক-অবক্ষয়-রোধে-করণীয়**

১২। https://islamqabd.com/**হ্যালোইন-উৎসব-এর-অন্ধকার/**

১৩। https://www.jugantor.com/international/399947/**হিজাব-পরলে-কোন-দেশে-কত-জরিমানা**

১৪। https://bangla.bdnews24.com/amp/story/blog%2F5683

১৫। https://www.jugantor.com/islam-life/503448/**থার্টি-ফার্স্ট-নাইট-উদযাপন-ইসলাম-কি-বলে**

১৬। https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2022/08/14/1172560